Contents

মাসিক

আত-তাহরীক

Web: www.at-tahreek.com

৮ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা
জানুয়ারী-২০০৫

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

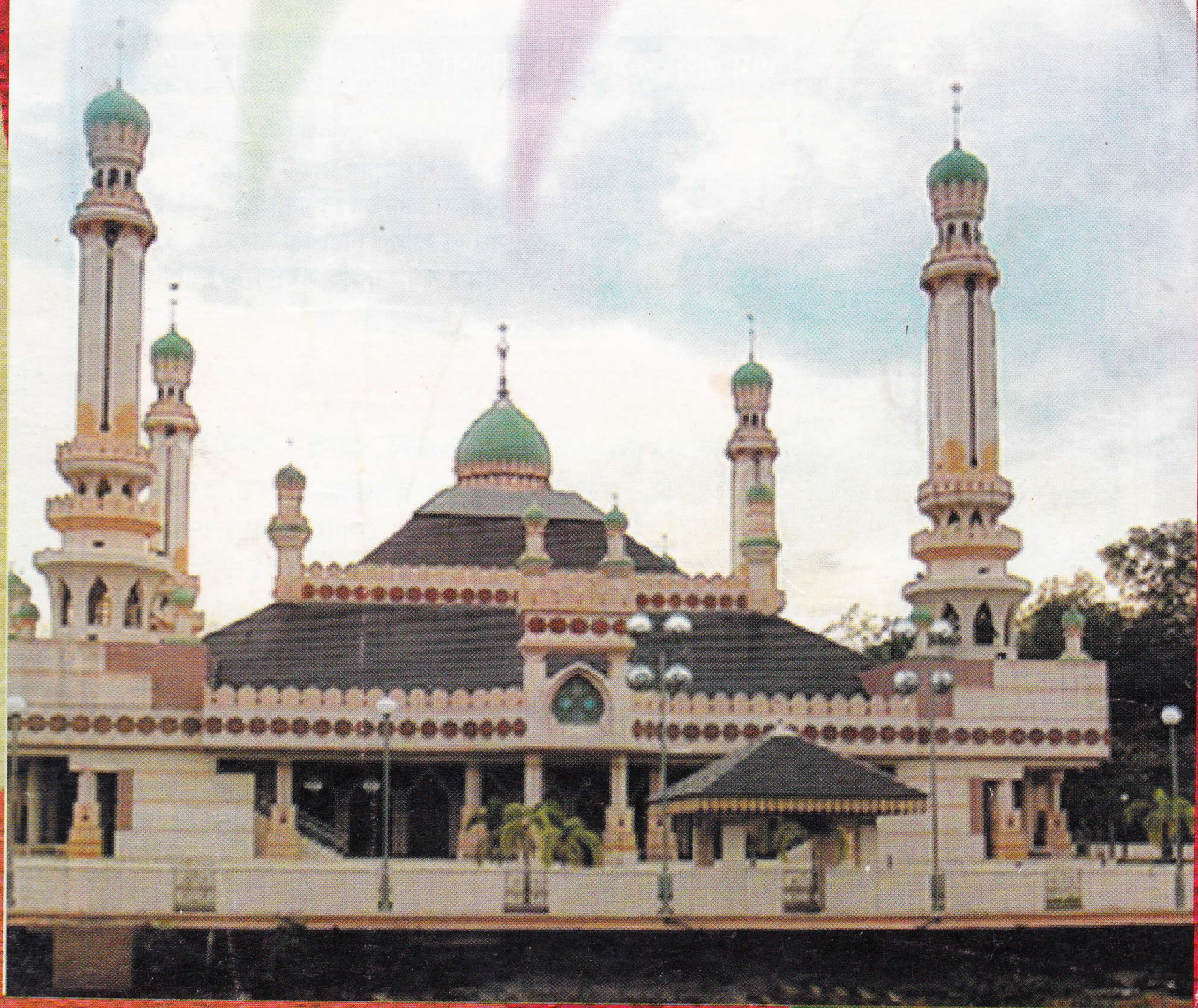

Contents

মাসিক

بسم الله الرحمن الرحيم

আত-তাহরীক

مجلة "التحريك" الشهرية علمية ادبية ودينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

৮ম বর্ষঃ	৪র্থ সংখ্যা
যুলক্বা'দাহ-যুলহিজ্জাহ	১৪২৫ হিঃ
পৌষ-মাঘ	১৪১১ বাং
জানুয়ারী	২০০৫ ইং

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সহকারী সম্পাদক
মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

সার্কুলেশন ম্যানেজার
আবুল কালাম মুহাম্মাদ সাইফুর রহমান

বিজ্ঞাপন ম্যানেজার
শামসুল আলম

কম্পোজঃ হাদীছ ফাউণ্ডেশন কম্পিউটার্স

যোগাযোগঃ
সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া মাদরাসা (বিমান বন্দর রোড),
পোঃ সপুরা, রাজশাহী। মোবাইলঃ ০১৭৫০০২৩৮০
মাদরাসা ও 'আত-তাহরীক' অফিস ফোনঃ (০৭২১) ৭৬১৩৭৮
সার্কুঃ ম্যানেজার মোবাইলঃ ০১৭ ১-৯৪ ৪৯১১
কেন্দ্রীয় 'যুবসংঘ' অফিস ফোনঃ ৭৬১৭৪১।
সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতিঃ
ফোন ও ফ্যাক্সঃ (বাসা) ৭৬০৫২৫।
ই-মেইলঃ tahreek@librabd.net
ওয়েবসাইটঃ www.at-tahreek.com

ঢাকাঃ
তাওহীদ ট্রাষ্ট অফিস ফোন ও ফ্যাক্সঃ ৮৯১৬৭৯২।
'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' অফিস ফোনঃ ৯৫৬৮২৮৯।

প্রচ্ছদ পরিচিতিঃ টোমাই মসজিদ, ব্রুনেই।

হাদিয়াঃ ১২ টাকা মাত্র।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী হতে কর্তৃক প্রকাশিত এবং
দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

- সম্পাদকীয় ০২
- প্রবন্ধঃ
  - আহলেহাদীছ আন্দোলন *(৩য় কিস্তি)* ০৩
    -মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
  - তাফসীরুল কুরআনঃ কিছু কথা *(২য় কিস্তি)* ০৭
    -মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
  - ইসলামী আন্দোলনে বিজয়ের স্বরূপ *(২য় কিস্তি)* ১৩
    -মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক
  - ইলমে নাহুঃ উৎপত্তি ও বিকাশ *(২য় কিস্তি)* ১৬
    -নূরুল ইসলাম
  - কুরবানীর ফাযায়েল ও মাসায়েল ১৯
    -আত-তাহরীক ডেস্ক
- সাময়িক প্রসঙ্গঃ
  - হত্যা, হন্তা, হতবাক ২২
    -মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান
- দিশারীঃ ২৪
  - হে হক্ব পিয়াসী মুমিন! প্রতারণা হতে সাবধান
    (শেষ কিস্তি) - মুযাফ্ফর বিন মুহসিন
- গল্পের মাধ্যমে জ্ঞানঃ ৩২
  - একজন দায়িত্বশীল অফিস প্রধান
    -মুহাম্মাদ আতাউর রহমান
- চিকিৎসা জগৎঃ
  - দুর্ঘটনায় দাঁত হারালে করণীয় ৩৩
- ক্ষেত-খামারঃ
  - খেজুরের পুষ্টিগুণ ৩৪
- কবিতাঃ ৩৫
- সোনামণিদের পাতাঃ ৩৬
- স্বদেশ-বিদেশ ৩৭
- মুসলিম জাহান ৪২
- বিজ্ঞান ও বিস্ময় ৪৩
- সংগঠন সংবাদ ৪৪
- জনমত কলাম ৪৬
- প্রশ্নোত্তর ৪৭

সম্পাদকীয়

ভারতীয় চেতনা বনাম মুক্তিযুদ্ধের চেতনা

বিগত ১১ই ডিসেম্বরের 'গণ অনাস্থা' প্রাচীরকে সামনে রেখে দেশের খ্যাতনামা ট্রাম্পকার্ড ব্যক্তিত্ব হঠাৎ গোপনে গত ৩০শে নভেম্বর মঙ্গলবার নয়াদিল্লী সফরে গিয়ে সেদেশের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ও গোয়েন্দা প্রধান সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সাক্ষাত শেষে ৪ঠা ডিসেম্বর শনিবার দেশে ফিরলেন। অতঃপর বিজয় দিবস উপলক্ষে ১৫ই ডিসেম্বর বুধবার ঢাকায় 'বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী সমিতি' আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির ভাষণে বললেন, ১৯৭১-এ আমরা পাকিস্তানের সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলাম। বাংলাদেশকে একটি উদার মুসলিম রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য স্বাধীনতাযুদ্ধ করিনি। অথচ বাংলাদেশকে এখন একটি মুসলিম রাষ্ট্রে পরিণত করার মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের সেই চেতনাকে চ্যালেঞ্জ করা হচ্ছে। আর এর ফলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব বর্তমানে ভয়াবহ বিপদের সম্মুখীন হয়ে পড়েছে'। তিনি বলেন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনার শরীক ভারতও। কারণ ভারতের রাষ্ট্রীয় মূলনীতি ও আদর্শিক চেতনা এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার মূলনীতি ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এক ও অভিন্ন। একারণেই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারত সহায়তা দেয়। তাই মুক্তিযুদ্ধের এ চেতনাকে রক্ষা করতে এখন ভারতকে অবশ্যই এগিয়ে আসতে হবে'। তিনি বর্তমান জোট সরকারের সাথে নীতিগত কোন সম্পর্ক না রাখার জন্য ভারতের প্রতি আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি ঢাকাস্থ ভারতীয় ডেপুটি হাই কমিশনার সর্বজিত চক্রবর্তী বলেন, বাংলাদেশের ভিতর দিয়ে ট্রানজিটের জন্য আমরা আর বেশীদিন অপেক্ষা করতে পারি না'। বিরাজমান পানি সমস্যা সম্পর্কে তিনি বলেন, বাংলাদেশকে ভারত প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশী পানি দিচ্ছে। বাণিজ্য বৈষম্য সম্পর্কে তিনি বলেন, দু'টি দেশের বাণিজ্য ভারসাম্যহীনতা ভবিষ্যতে খুব একটা কমার সম্ভাবনা নেই'।

উপরোক্ত বক্তব্যগুলি একটি স্বাধীন দেশের রাজধানীতে বসে কোন বিদেশী কর্মকর্তা বলতে পারেন, ইতিপূর্বে আমাদের জানা ছিল না। তার চেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার হ'ল এই যে, তাকে এসব কথা বলার সাহস যুগিয়েছেন এদেশেরই কিছু দলনেতা। যারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা টিকে থাকার মূল চেতনায় আঘাত করেছেন। যে চেতনা ধ্বংস করা ব্যতীত এপার বাংলা-ওপার বাংলা মিলে গিয়ে ভারতের মধ্যে একীভূত হওয়া কিংবা নিদেন পক্ষে তার আশ্রিত রাষ্ট্রে পরিণত হওয়া সম্ভব নয়। সে চেতনার নাম হ'ল 'ইসলাম'। ইসলামী চেতনাই পূর্ববঙ্গকে পশ্চিমবঙ্গ থেকে পৃথক রাজনৈতিক মর্যাদা দিয়েছে এবং আজকের পৃথিবীর অন্যতম ঈর্ষনীয় স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ার সুযোগ দান করেছে। আজ আমরা ভারতের একটি প্রদেশ থাকলে যেসকল ব্যক্তি এখন জাতীয় নেতা বনেছেন, তারা তখন পাতি নেতা হবারও সুযোগ পেতেন না। যারা এখন একটি জাতীয় সেনাবাহিনীর সর্বোচ্চ পদে এসেছেন, বা মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রী ও বড় আমলা হয়েছেন, তারা তখন কত দর্জা নীচে থাকতেন, তার হিসাব থাকতো না। যে চেতনাকে বাঁচাতে গিয়েই নবাব সলিমুল্লাহ, ফযলুল হক, সোহরাওয়ার্দী ও সবুর খানের মত নেতাগণ সেদিন জান বাজি রেখে গোঁড়া সাম্প্রদায়িক হিন্দু নেতাদের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন। ১৯৪৬ সালে কলিকাতা রায়টের রক্তাক্ত দিনগুলিতে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী সামনে বুক পেতে না দিলে আরও হাযার হাযার মুসলমান সেদিন শহীদ হয়ে যেত। মুহাম্মাদ আলী জিন্নাহ্‌র রাজনৈতিক প্রজ্ঞার কারণেই আমরা পূর্ব পাঞ্জাবের বিনিময়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম পেয়েছিলাম। খান এ, সবুর, না থাকলে আমরা বৃহত্তর খুলনা-যশোরকে হারাতাম। তবুও গান্ধী-নেহরু-প্যাটেলের ষড়যন্ত্রে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ কাশ্মীর পাকিস্তানের হাতছাড়া হয়েছে। হাতছাড়া হয়েছে মুর্শিদাবাদ-মালদহ এবং সিলেটের করিমগঞ্জ সহ বহু মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা, যা ছিল পূর্ব পাকিস্তানের প্রাপ্য। বাংলাদেশ আজ সেই মানচিত্রের উপরেই দাঁড়িয়ে আছে। সেদিন শেরে বাংলা ফযলুল হকের পেশকৃত লাহোর প্রস্তাবের আলোকে 'পূর্ব পাকিস্তান' স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্যাদা পেলে আমাদেরকে ১৯৭১-এর রক্তাক্ত ইতিহাসের সম্মুখীন হ'তে হতো না। সেই প্রস্তাবই অবশেষে বাস্তবায়িত হয়েছে। তবে তাঁদের মৃত্যুর পরে অনেক ত্যাগের বিনিময়ে। পশ্চিম পাকিস্তানের অদূরদর্শী ও হঠকারী নেতারাই ছিল পাকিস্তান ভাঙ্গার জন্য দায়ী। তাদের যুলুম ও অত্যাচারে অতিষ্ট এদেশের মানুষের পুঞ্জিভূত ক্ষোভ ও অন্তর্জ্বালাকে সুযোগমত ব্যবহার করেই ভারত তার জনমশত্রু পাকিস্তানকে ভেঙ্গে ফেলতে চেয়েছিল। তারা ত্রাণকর্তা সেজে অর্থ ও অস্ত্র দিয়ে অবশেষে নিজ দেশের সেনাবাহিনী দিয়ে সরাসরি যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল এবং অপ্রস্তুত অসহায় আমাদের নেতাদেরকে লজ্জাকর গোলামী চুক্তিতে বাধ্য করেছিল। পাকিস্তানীদের সকল অস্ত্রশস্ত্র এবং এদেশের বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানের কয়েক হাযার কোটি টাকার কল-কব্জা যন্ত্রপাতি সব তারা লুটে নিয়েছিল। প্রতিবাদ করায় মেজর জলিল গ্রেফতার হলেন। মাওলানা ভাসানী মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস কার্যতঃ গৃহবন্দী থাকলেন। প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিব ১৯৭৪ সালে ভারতের আকাশ দিয়ে উড়ে গিয়ে তাদের রক্তচক্ষুকে তোয়াক্কা না করেই লাহোরে অনুষ্ঠিত 'ইসলামী সম্মেলন সংস্থা'র বৈঠকে যোগদান করলেন। তাঁকে বাগে ফেরানো মুশকিল বুঝলো ষড়যন্ত্রকারীরা। অতএব, তখনকার টালমাটাল রাজনৈতিক অবস্থার সুযোগে সেনাবাহিনীর কিছু ক্ষুব্ধ ব্যক্তিকে কাজে লাগালো তারা। প্রতিফল তিনি পেলেন মর্মান্তিকভাবে। সেদিন তাকে কোন 'রাযাকার' (রেযাকার) মারেনি। মেরেছিল তাঁরই বিশ্বাসী লোকেরা। সেদিন এর প্রতিবাদে বর্তমান নেতারা টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করেননি, বরং নেতার লাশ সিঁড়িতে ফেলে রেখে দৌড়ে গিয়ে মন্ত্রীত্বের শপথ নিয়েছিলেন। তারাই এখন নেতাপ্রেমে গদগদ হয়ে অযথা দেশটাকে রাযাকার ও মুক্তিযোদ্ধা, স্বাধীনতার পক্ষ ও বিপক্ষ শক্তিতে ভাগাভাগি করে 'বিভক্ত কর ও রাজনীতি কর' এই নোংরা ও পিচ্ছিল পথ ধরে এগিয়ে চলেছেন। অথচ বিশাল হৃদয় শেখ মুজিব ও জিয়াউর রহমান এসব বিভক্তি শেষ করে দিয়ে গেছেন।

ঐসব নেতারা মুক্তিযুদ্ধ করেছেন হয়তবা কলিকাতার হোটেলে বসে। আর আমরা তা প্রত্যক্ষ করেছি গ্রামে-গঞ্জে নির্যাতিত মানুষের মধ্যে থেকে। এদেশের মানুষ পশ্চিম পাকিস্তানীদের যুলুমের বিরুদ্ধে ছিল। কিন্তু ইসলামী আদর্শের বিরুদ্ধে ছিল না। আমরা কখনোই করাচীর গোলামী ছিন্ন করে দিল্লীর দাসত্বের শৃংখলে বন্দী হ'তে চাইনি। একটা সাধারণ কুলি-মজুর পর্যন্ত এতে বিশ্বাসী ছিল না। 'জয় বাংলা'-র বদলে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলায় অসংখ্য তরুণকে সেদিন পাখির মত গুলি খেয়ে মরতে দেখেছি। অথচ ট্রাম্পকার্ড নেতারা এখন ভারতীয় চেতনা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে এক করে দেখছেন। যার সহজ-সরল অর্থ হ'ল ভারতীয় চেতনা ও রাষ্ট্র সত্তার মধ্যে বিলীন হয়ে যাওয়া।

তারা বলেছেন, বাংলাদেশকে একটি উদার মুসলিম রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য স্বাধীনতা যুদ্ধ করিনি; তাহ'লে কি নেতারা এদেশটিকে গোঁড়া হিন্দুরাষ্ট্র বানাতে চাচ্ছেন? যারা প্রতিদিন ভারতে মুসলমানদের রক্ত ঝরাচ্ছে। যাদের ভয়ে সেখানকার মুসলমানেরা মসজিদে মাইকে আযান দিতে পারে না, কুরবানীতে গরু যবেহ করতে পারে না। যাদের কথিত ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতন্ত্রের আশ্রাসনে সেদেশের শিক্ষা-দীক্ষা, চাকুরী-বাকুরী, ব্যবসা-বাণিজ্য সকল ক্ষেত্রে মুসলমানদেরকে অধিকার বঞ্চিত করা হচ্ছে। যে 'বঙ্গভঙ্গ' রদ করে দুই বাংলাকে এক করার অভিলাষে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'বাংলা' মায়ের বন্দনা গেয়ে কবিতা লিখে হিন্দুনেতাদের উত্তেজিত করলেন, সেই গানটিকে সেদিন নেতারা বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত বানালেন। যে গান এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগণের তাওহীদী চেতনার সম্পূর্ণ বিরোধী এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও অখণ্ডতার বিরোধী। নেতারা এখন তাই ভারতকে ডেকে আনতে চাচ্ছেন 'চেতনা' উদ্ধার করার জন্য। ভারত এখানে এলে এবার চেতনা উদ্ধার করবে না, দেশের স্বাধীনতা উদ্ধার করে ছাড়বে। ঠিক যেভাবে আফগানিস্তান ও ইরাকে আমেরিকা 'গণতন্ত্র' উদ্ধার করতে এসেছে। যেভাবে লেন্দুপ দর্জির আহ্বানে ভারত সিকিমকে গ্রাস করে নিয়েছে। নেতারা যদি সেটা করতে চান, তবে মারাত্মক ভুল করবেন। যেমন ভুল করেছিল মীরজাফর ক্লাইভকে ডেকে এনে নিজেদের নবাবীর স্বার্থে।

বাংলাদেশকে যারা প্রতিবছর শুকিয়ে ও ডুবিয়ে মারছে এবং পর্বত প্রমাণ বাণিজ্য বৈষম্য ও চোরাচালানীর মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিকে পঙ্গু করে দিচ্ছে, সেই চিহ্নিত প্রতিবেশীর একজন ডেপুটি হাই কমিশনার আমাদের নেতাদের সামনে আমাদের রাজধানীতে বসে হুমকি দিচ্ছে 'ট্রানজিটের জন্য আমরা আর বেশীদিন অপেক্ষা করতে পারি না'। 'বাংলাদেশকে ভারত প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশী পানি দিয়েছে'। তাহ'লে তাঁরা কি যবরদস্তি ট্রানজিট আদায় করবেন? তারা কি তাহ'লে পানি একেবারেই বন্ধ করে দিবেন? এভাবে বাণিজ্য শোষণ চালিয়েই যাবেন? এগুলো শুনেও যেসকল নেতা চুপ করে থাকেন, তাদের দেশপ্রেমকে আমরা সন্দেহ করি। যদি বলি, ১৯৭৪-এর মুজিব-ইন্দিরা চুক্তির ফলে তারা বেরুবাড়ী নিয়ে নিল। কিন্তু বিনিময়ে তিন বিঘা করিডোর কেন আজও পুরোপুরি দেয়নি? কেন তারা বাংলাদেশের সীমানায় জেগে ওঠা বিশাল চর দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপ দখল করে রেখেছে? আমাদের নেতারা কি কখনো তাদের কাছে এসব বিষয়ে কৈফিয়ত চেয়েছেন? তাই বলি, ভারতের নেতাদের আদর্শিক চেতনা হ'ল নিজ দেশের অহিন্দুদের নির্যাতন ও বঞ্চিত করা এবং প্রতিবেশী দেশগুলোকে শোষণ, লুণ্ঠন ও দখল করা। আর আমাদের জনগণের আদর্শিক চেতনা হ'ল আল্লাহ্‌র গোলামীর অধীনে হিন্দু-মুসলিম সকল নাগরিকের সমানাধিকার নিশ্চিত করা ও নিজেদের স্বাধীন অস্তিত্ব নিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকা। ভারতীয় নেতাদের আদর্শিক চেতনা হ'ল 'বন্দে মাতরম' 'জয় হিন্দ' ও 'জয় বাংলা'। পক্ষান্তরে বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের আদর্শিক চেতনা হ'ল 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। এই চেতনাকে বোমা মেরে হত্যা করা যাবে না। নিঃসন্দেহে মুক্তিযোদ্ধা মেজর জলিলের চেতনা ও নেতা আব্দুল জলিলের চেতনা এক নয়। যেমন এক ছিল না মুক্তিযোদ্ধা মেজর জিয়ার চেতনা ও খালেদ মোশাররফের চেতনা। এক ছিলনা মাওলানা ভাসানীর চেতনা ও চিহ্নিত রাজনৈতিক নেতা ও বুদ্ধিজীবীদের চেতনা। আমরা উভয় দেশের নেতাদেরকে উভয় দেশের স্বাধীনতা ও সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের আদর্শিক চেতনার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের আহ্বান জানাই। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন! (স.স.)।

প্রবন্ধ

হাদীছ আন্দোলন

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

(৩য় কিস্তি)

আহলুল হাদীছ ও আহলুর রায়ঃ

'আহলুল হাদীছ' অর্থ হাদীছের অনুসারী। 'আহলুর রায়' অর্থ রায়-এর অনুসারী। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ভিত্তিতে যারা জীবন সমস্যার সমাধান তালাশ করেন, তাঁদেরকে 'আহলুল হাদীছ' বলা হয়। পক্ষান্তরে.... পূর্বসূরী কোন বিদ্বানের রচিত কোন ফিক্বহী উছূল বা ব্যবহারিক আইন সূত্রের ভিত্তিতে যারা জীবন সমস্যার সমাধান নেন, শাহ অলিউল্লাহ্র ভাষায় তাদেরকে 'আহলুর রায়' বলা হয়। আহলুর রায়গণ উদ্ভূত কোন সমস্যার সমাধান রাসূলের হাদীছ ও ছাহাবায়ে কেরামের আছারের মধ্যে তালাশ না করে পূর্ব যুগে কোন মুজতাহিদ ফক্বীহের গৃহীত কোন ফিক্বহী সিদ্ধান্ত বা ফিক্বহী মূলনীতির সঙ্গে সাদৃশ্য বিধানের চেষ্টা করে থাকেন এবং তার উপরে ক্বিয়াস বা উপমান পদ্ধতির মাধ্যমে বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা বের করে থাকেন।[২৮] এভাবে প্রায় সকল বিষয়ে তিনি তাঁর অনুসরণীয় ইমাম বা ফক্বীহ্-এর পরিকল্পিত 'উছূলে ফিক্বহ' বা ব্যবহারিক আইনসূত্র সমূহের দিকে প্রত্যাবর্তন করেন। ফলে অনেক ক্ষেত্রে তাঁরা ছহীহ হাদীছের উর্ধ্বে ব্যক্তির রায়কে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকেন।

পক্ষান্তরে আহলুল হাদীছগণ সর্বাবস্থায় পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের সিদ্ধান্তকে সবার উর্ধ্বে স্থান দেন এবং যে কোন ব্যক্তির হাদীছ বিরোধী রায়কে প্রত্যাখ্যান করেন। **তাঁরা রায়-এর ভিত্তিতে কুরআন-হাদীছ যাচাই করেন না। বরং কুরআন ও হাদীছের ভিত্তিতে রায়কে যাচাই করেন**। তাঁরা 'অহি'-কে 'রায়' বা মানবিক জ্ঞান-এর উপরে অগ্রাধিকার দেন এবং 'রায়'-কে 'অহি'-র ব্যাখ্যাকারী বলে মনে করেন। কুরআন বা ছহীহ হাদীছের সিদ্ধান্ত নিজের বা নিজের অনুসরণীয় কোন ব্যক্তির রায় বা আইনসূত্রের পরিপন্থী হ'লে তাঁরা বিভিন্ন অজুহাতে হাদীছ প্রত্যাখ্যান করেন না; বরং হাদীছের সিদ্ধান্তকে মাথা পেতে গ্রহণ করেন। আহলেহাদীছগণ 'ইজতিহাদে' বিশ্বাসী এবং তা সকল যুগের সকল যোগ্য আলেমের জন্য উন্মুক্ত বলে মনে করেন। তাঁরা ঐ ধরনের ইজতিহাদ বা রায় ও ক্বিয়াসে বিশ্বাসী, যা কুরআন, ছহীহ হাদীছ ও ইজমায়ে ছাহাবার উপরে ভিত্তিশীল।

এ কারণে ইমাম মালেক, শাফেঈ, আহমাদ, ইসহাক্ব, ইমাম বুখারী প্রমুখ উম্মতের সেরা ফক্বীহ ও মুজতাহিদগণকে 'আহলুর রায়' না বলে বরং 'আহলুল হাদীছ' বলা হয়। পক্ষান্তরে হাদীছের সংগ্রহ কম থাকার কারণে নিজের রায় ও ক্বিয়াসের উপরে অধিক নির্ভরশীল হওয়ার ফলে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-কে 'আহলুর রায়দের ইমাম' বলা হয়ে থাকে। যেমন মরক্কোর জগদ্বিখ্যাত ঐতিহাসিক ও সমাজবিজ্ঞানী আব্দুর রহমান ইবনু খলদূন (৭৩২-৮০২ হিঃ) বলেন,

وَانْقَسَمَ الْفِقْهُ فِيْهِمْ إِلَى طَرِيْقَتَيْنِ، طَرِيْقَةُ أَهْلِ الرَّأْيِ وَ الْقِيَاسِ وَ هُمْ أَهْلُ الْعِرَاقِ وَ طَرِيْقَةُ أَهْلِ الْحَدِيْثِ وَ هُمْ أَهْلُ الْحِجَازِ وَ كَانَ الْحَدِيْثُ قَلِيْلاً فِيْ أَهْلِ الْعِرَاقِ ... فَاسْتَكْثَرُوْا مِنَ الْقِيَاسِ وَ مَهَرُوْا فِيْهِ، فَلِذَالِكَ قِيْلَ أَهْلُ الرَّأْيِ وَ مُقَدَّمُ جَمَاعَتِهِمُ الَّذِيْ اسْتَقَرَّ الْمَذْهَبُ فِيْهِ وَ فِيْ أَصْحَابِهِ أَبُوْ حَنِيْفَةَ –

'(আহলেসুন্নাত বিদ্বানগণের মধ্যেও যুক্তিবাদের ঢেউ লাগে) ফলে তাদের মধ্যে ফিক্বহ শাস্ত্র 'আহলুল হাদীছ' ও 'আহলুর রায়' নামে দু'টি প্রধান ধারায় বিভক্ত হয়ে যায়। একটি হ'লঃ রায় ও ক্বিয়াসপন্থীদের তরীকা। তারা হ'লেন ইরাকের অধিবাসী। দ্বিতীয়টি হ'লঃ হাদীছপন্থীদের বা আহ্লুল হাদীছদের তরীকা। তারা হ'লেন হেজাযের (মক্কা-মদীনার) অধিবাসী। ইরাকীদের মধ্যে হাদীছ খুবই কম ছিল... ফলে তারা ক্বিয়াস বেশী করেন ও এতে দক্ষতা অর্জন করেন। আর একারণেই তারা 'আহলুর রায়' বা রায়পন্থী নামে অভিহিত হয়েছেন। এই দলের নেতা ছিলেন আবু হানীফা, যাঁর নামে একটি মাযহাব প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে'।[২৯] উল্লেখ্য যে, ইরাকেই সর্বপ্রথম হাদীছ জাল করা শুরু হয়। এদিকে ইঙ্গিত করেই ইমাম ইবনু শিহাব যুহরী (৫০-১২৪ হিঃ) বলেন, 'আমাদের এখান থেকে এক বিঘত পরিমাণ একটি হাদীছ বের হয়ে ইরাক থেকে এক হাত পমিাণ লম্বা হয়ে ফিরে আসে'। ইমাম মালেক (৯৩-১৭৯ হিঃ) ইরাককে 'হাদীছ ভাঙ্গানোর কারখানা' (دَارُ الضَّرْبِ) নামে আখ্যায়িত করেছেন। অর্থাৎ একটি ছহীহ হাদীছের মধ্যে অসংখ্য যোগ-বিয়োগ করে তাকে ভাঙ্গিয়ে প্রচার করা হয়।[৩০] ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) ছিলেন ইরাকের কূফা নগরীর অধিবাসী এবং তাঁর প্রধান শিষ্যগণ ছিলেন সেখানকার। এজন্য তাঁর অনুসারীদেরকে হানাফী, কূফী, আহলুর রায়, আহলুল কূফা, আহলুল ইরাক্ব ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে।

---

২৮. *শাহ অলিউল্লাহ, 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ' (কায়রোঃ ১৩২২ হিঃ) ১/১২৯ পৃঃ; বিস্তারিত জানার জন্য 'আহলুল হাদীছ ও আহলুর রায়-এর পার্থক্য' শীর্ষক আলোচনা দ্রষ্টব্যঃ ঐ, পৃঃ ১১৮-১২২।*

২৯. *আব্দুর রহমান ইবনু খালদূন, তারীখ (বৈরুতঃ মুওয়াস্সাসাতুল আ'লামী, তাবি) মুক্বাদ্দামা ১/৪৪৬।*

৩০. *ডঃ মুছতফা সাবাঈ, আস-সুন্নাহ (বৈরুতঃ আল-মাকতাবুল ইসলামী, ৪র্থ সংস্করণ ১৪০৫/১৯৮৫) পৃঃ ৭৯।*

তাক্বলীদে শাখ্ছীঃ তাক্বলীদ 'ক্বালাদাহ' হ'তে গৃহীত। যার অর্থ 'গলাবন্ধ'। তাক্বলীদ-এর আভিধানিক অর্থঃ গলায় রশি বাঁধা। পারিভাষিক অর্থঃ قَبُوْلُ قَوْلِ الْغَيْرِ مِنْ غَيْرِ دَلِيْلٍ 'শারঈ বিষয়ে কারু কোন কথা বিনা দলীলে মেনে নেওয়া'। পক্ষান্তরে 'ইত্তেবা'র আভিধানিক অর্থঃ পদাংক অনুসরণ করা। পারিভাষিক অর্থঃ قَبُوْلُ قَوْلِ الْغَيْرِ مَعَ دَلِيْلٍ 'শারঈ বিষয়ে কারু কোন কথা দলীল সহ মেনে নেওয়া'। তাক্বলীদ হ'ল রায়-এর অনুসরণ এবং ইত্তেবা হ'ল দলীলের অনুসরণ। উল্লেখ্য যে, কোন আলেমের ছহীহ দলীল ভিত্তিক কোন কথাকে মেনে নেওয়ার নাম 'তাক্বলীদ' নয়, বরং তা হ'ল 'ইত্তেবা'। অনুরূপভাবে কোন আলেমের দেওয়া ফৎওয়ার বিপরীতে কোন ছহীহ দলীল পাওয়া গেলে উক্ত ফৎওয়া পরিত্যাগ করে ছহীহ দলীলের অনুসরণ করাকে বলা হয় 'ইত্তেবা'। ছাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈনে এযামের যুগে তাক্বলীদের কোনরূপ নামগন্ধ ছিল না। বরং তাঁদের দলীলভিত্তিক কথার অনুসরণকে অনেকে 'তাক্বলীদ' বলে ভুল বুঝিয়ে থাকেন।

আহলেহাদীছ আন্দোলন ও অন্যান্য ইসলামী আন্দোলনের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য হ'ল 'তাক্বলীদে শাখ্ছী' বা অন্ধ ব্যক্তিপূজা। ২য় শতাব্দী হিজরীর পরে প্রচলিত তাক্বলীদের আবির্ভাব ঘটে। অতঃপর ৪র্থ শতাব্দী হিজরীতে বিভিন্ন ইমামের নামে বিভিন্ন তাক্বলীদী মাযহাবের প্রচলন হয়। শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী (রহঃ) বলেন,

إِعْلَمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوْا قَبْلَ الْمِائَةِ الرَّابِعَةِ غَيْرَ مُجْمَعِيْنَ عَلَى التَّقْلِيْدِ الْخَالِصِ لِمَذْهَبٍ وَّاحِدٍ بِعَيْنِهِ،

'জেনে রাখ হে পাঠক! ৪র্থ শতাব্দী হিজরীর পূর্বে কোন মুসলমান নির্দিষ্টভাবে কোন একজন বিদ্বানের মাযহাবের তাক্বলীদের উপরে সংঘবদ্ধ ছিল না'। ... কোন সমস্যা সৃষ্টি হ'লে লোকেরা যেকোন আলেমের নিকট থেকে ফৎওয়া জেনে নিত। এ ব্যাপারে কারু মাযহাব যাচাই করা হ'ত না'।[৩১]

হাফেয শামসুদ্দীন যাহাবী (৬৭৩-৭৪৮ হিঃ) তৃতীয় শতাব্দী হিজরীর শেষদিকের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, 'এই সময় 'আহলুর রায়' (হানাফী) ফক্বীহদের নেতৃস্থানীয় অনেক আলেম, মু'তাযিলা, শী'আ ও কালাম শাস্ত্রবিদ (দার্শনিক) গণের স্তম্ভ বিশেষ বহু পণ্ডিত বর্তমান ছিলেন, যারা যুক্তিবাদের উপরে ভিত্তি করে চলতেন এবং নবীর হাদীছকে কঠিনভাবে আঁকড়ে থাকার•সালাফে ছালেহীনের তরীকা এড়িয়ে চলতেন। এই সময় ফক্বীহদের মধ্যে তাক্বলীদ আত্মপ্রকাশ করে ও ইজতিহাদের অবক্ষয় শুরু হয়'।[৩২]

ইমাম গাযযালী (৪৫০-৫০৫ হিঃ) বলেন, খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগ শেষ হবার পরে ইসলামী খেলাফত এমন সব লোকদের কুক্ষিগত হয়ে পড়ে, যারা শারঈ বিধানে ছিলেন অনভিজ্ঞ। ফলে তারা সকল বিষয়ে ফক্বীহদের উপরে নির্ভরশীল হয়ে পড়েন এবং তাদেরকে বিভিন্ন সরকারী পদে তলব করা হ'তে থাকে। ফলে তখন লোকেরা ইল্ম শিখতে লাগল সম্মান ও প্রতিপত্তি হাছিলের মাধ্যম হিসাবে। মুসলিম পণ্ডিতগণের কেউ কেউ কালাম শাস্ত্রের উপরে গ্রন্থ রচনা শুরু করেন। সেখানে বহু কুটতর্কের অবতারণা করা হ'ল। এই সময় শাসকগণ হানাফী ও শাফেঈ ফিক্বহের পারস্পরিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের উদ্দেশ্যে বিতর্ক অনুষ্ঠানের প্রতি আগ্রহী হ'লেন। ফলে বিদ্বানগণ উক্ত দুই মাযহাবের মধ্যকার বিতর্কিত বিষয় সমূহের পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি সমূহের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের প্রতিযোগিতায় নেমে পড়েন এবং বহু ঝগড়া ও অসংখ্য বই-পুস্তকাদি প্রণয়ন করেন। এইভাবে স্ব স্ব মাযহাবের পক্ষে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তাৎপর্য সমূহ উদ্ধার করাকেই তারা তাদের মৌল উদ্দেশ্য হিসাবে গণ্য করেন। এই অবস্থা এখনও চলছে। আমরা জানি না ভবিষ্যতের লিখন কি আছে? (সংক্ষেপায়িত)।[৩৩]

অতঃপর শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী বলেন, '(হে পাঠক!) বর্তমান সময়ে বিশ্বের প্রায় সকল অঞ্চলে তুমি মুসলমানদের দেখবে যে, তারা বিগত কোন একজন মুজতাহিদ বিদ্বানের মাযহাবের অনুসরণ করে থাকে। তারা মনে করে যে, একটি মাসআলাতেও যদি ঐ বিদ্বানের তাক্বলীদ হ'তে সে বেরিয়ে আসে, তাহ'লে হয়তবা সে মুসলিম মিল্লাত থেকেই খারিজ হয়ে যাবে। ঐ বিদ্বান যেন একজন নবী, যাকে তার কাছে প্রেরণ করা হয়েছে (كَأَنَّهُ نَبِيٌّ بُعِثَ إِلَيْهِ) এবং যার অনুসরণ তার উপরে ফরয করা হয়েছে। অথচ ৪র্থ শতাব্দী হিজরীর পূর্বে কোন মুসলমান কোন একটি নির্দিষ্ট মাযহাবের অনুসারী ছিলেন না।[৩৪]

আহলেহাদীছের ইস্তিদলালী পদ্ধতিঃ শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী (রহঃ) ইসলামী বিধান প্রণয়নে আহলেহাদীছ বিদ্বানদের অনুসৃত 'ইস্তিদলালী পদ্ধতি' বা দলীল গ্রহণের নীতিমালা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, '(১) কোন বিষয়ে কুরআনের স্পষ্ট নির্দেশ পেলে তাঁরা তাই গ্রহণ করেন। অন্যদিকে মুখ ফিরানোকে তাঁরা জায়েয মনে করেন না (২) কোন বিষয়ে কুরআনের কোন নির্দেশ অস্পষ্ট হ'লে সেক্ষেত্রে 'সুন্নাহ' ফায়ছালাকারী হবে। উক্ত হাদীছ সর্বত্র

৩১. *শাহ অলিউল্লাহ, হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ ১/১৫২-৫৩ 'চতুর্থ শতাব্দী ও তার পরের লোকদের অবস্থা বর্ণনা' অনুচ্ছেদ।*

৩২. *যাহাবী, তাযকেরাতুল হুফফায (বৈরুতঃ ছাপা, তাবি) ২/২৬৭ পৃঃ।*

৩৩. *শাহ অলিউল্লাহ, হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ ১/১৫৩ পৃঃ।*

৩৪. *শাহ অলিউল্লাহ, তাফহীমাতে ইলাহিয়াহ (ইউ,পি,বিজনৌর ১৩৫৫/১৯৩৬) ১/১৫১ পৃঃ।*

প্রচারিত থাকুক বা না থাকুক, তার উপরে ছাহাবীগণ বা ফক্বীহগণ আমল করুন বা না করুন। কোন বিষয়ে 'হাদীছ' পাওয়া গেলে তার বিপরীতে কোন ছাহাবীর 'আছার' কিংবা কোন মুজতাহিদের 'ইজতিহাদ' গ্রহণযোগ্য হবে না (৩) সার্বিক প্রচেষ্টার পরেও কোন বিষয়ে হাদীছ না পাওয়া গেলে আহলেহাদীছগণ ছাহাবী ও তাবেঈগণের যেকোন একটি জামা'আতের সিদ্ধান্ত অনুসরণ করেন। এক্ষেত্রে তাঁরা কোন একটি দল, শহর বা এলাকার অধিবাসীকে নির্দিষ্টভাবে অগ্রগণ্য করেন না (৪) যদি কোন বিষয়ে খুলাফায়ে রাশেদীন ও ফক্বীহগণ একমত হন, তবে তাকেই তাঁরা যথেষ্ট মনে করেন (৫) কিন্তু যদি সেখানে মতভেদ থাকে, তবে তাঁদের মধ্যে যিনি সর্বাধিক বিদ্বান, পরহেযগার ও স্মৃতিধর তাঁর কথা অথবা তাঁদের মধ্যকার সর্বাধিক প্রসিদ্ধ কথাটি গ্রহণ করেন (৬) যখন কোন বিষয়ে সমশ্রেণীভুক্ত দু'টি বক্তব্য পাওয়া যায়, তখন সেক্ষেত্রে তাঁরা দু'টিকেই গ্রহণযোগ্য মনে করেন (৭) কিন্তু যখন সেটিতেও ব্যর্থ হন, তখন তাঁরা কিতাব ও সুন্নাতের সাধারণ নির্দেশ ও ইঙ্গিত সমূহ এবং উদ্দেশ্যাবলী অনুধাবন করেন। অতঃপর উক্ত বিষয়ের অনুরূপ বিগত কোন অভিন্ন নযীর বা কাছাকাছি দৃষ্টান্ত তালাশ করেন। এ বিষয়ে তাঁরা প্রচলিত কোন উছূল বা ব্যবহারিক আইন সূত্রের অনুসরণ করেন না। বরং যে কথাটি তাঁরা উত্তমরূপে বুঝতে পারেন ও যা তাঁদের হৃদয়কে সুশীতল করে, তারই অনুসরণ করেন'।[৩৫]

হানাফী মাযহাবের বিস্তৃতির কারণঃ হানাফী মাযহাব সর্বত্র দ্রুত ছড়িয়ে পড়ার মূল কারণ ছিল রাজনৈতিক। খলীফা মাহ্দী, হাদী ও হারূনুর রশীদের আমলে (১৫৮-১৯৩ হিঃ) ইমাম আবু হানীফার প্রধান শিষ্য আবু ইউসুফ (১১৩-১৮২ হিঃ) দেশের প্রধান বিচারপতি থাকার সুবাদে ইরাক, ইরান ও মধ্য তুর্কিস্তান সহ খেলাফতের সর্বত্র হানাফী মাযহাবের ফাতাওয়া ও সিদ্ধান্ত সমূহ প্রচার ও প্রতিষ্ঠা লাভ করে। শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী (রহঃ) এদিকে ইঙ্গিত করে বলেন,

فَكَانَ سَبَبًا لِظُهُوْرِ مَذْهَبِهِ 'এটাই ছিল তাঁর মাযহাব সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ার মূল কারণ'।[৩৬] আবদুল হাই লাক্ষ্ণৌবীও (১২৬৪-১৩০৪/১৮৪৮-৮৬) একথা সমর্থন করে বলেন, هُوَ أَوَّلُ مَنْ نَشَرَ عِلْمَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ فِيْ أَقْطَارِ الْأَرْضِ وَثَبَتَ الْمَسَائِلَ। 'তিনিই প্রথম আবু হানীফার ইল্ম পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে দেন ও তাঁর মাসআলা সমূহ প্রতিষ্ঠিত করেন'।[৩৭]

দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও ইসলাম এসেছিল রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) ও খলীফাদের আমলেই আরব বণিক ও মুহাদ্দিছ ওলামায়ে কেরামের মাধ্যমে। বিভিন্ন মাযহাব সৃষ্টির পূর্বে আগত সেই ইসলাম ছিল হাদীছ ভিত্তিক নির্ভেজাল ইসলাম। নিঃসন্দেহে তাঁরা ছিলেন 'আহলেহাদীছ'। পরবর্তীতে হানাফী মতাবলম্বী সেনাপতি ইখতিয়ারুদ্দীন মুহাম্মাদ বিন বখতিয়ার খিলজী কর্তৃক ৬০২ হিজরী মোতাবেক ১২০১ খৃষ্টাব্দের সামরিক বিজয় ও তাঁর সাথে ও পরে আগত তুর্কী হানাফী আলেম ও মা'রেফতী ফকীরদের মাধ্যমে প্রচারিত হানাফী ও মা'রেফতী ইসলাম প্রধানতঃ রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতায় এদেশে প্রসার লাভ করে। যার অধিকাংশ আমল ছিল শিরক ও বিদ'আতে ভরা। যদিও সোনারগাঁওয়ের মুহাদ্দিছ শারফুদ্দীন আবু তাওয়ামা (মৃঃ ৭০০ হিঃ/১৩০০ খৃঃ) ও তার শিষ্যদের প্রচেষ্টায় আহলেহাদীছ আন্দোলন চালু থাকে। উল্লেখ্য যে, বোখারা (রাশিয়া) থেকে আগত এই স্বনামধন্য মুহাদ্দিছ-এর মাধ্যমেই উপমহাদেশের মধ্যে বাংলাদেশেই সর্বপ্রথম বুখারী ও মুসলিমের দরস চালু হয়। তিনি সোনারগাঁয়ে দীর্ঘ ২২ বছর যাবৎ ছহীহায়েন-এর দরস দিয়েছিলেন। বলা চলে যে, প্রধানতঃ তাঁরই প্রচেষ্টায় এদেশে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' সর্বাধিক প্রসার লাভ করে। পরবর্তীতে তুর্কী, মোগল, শী'আ, পাঠান, আফগান প্রভৃতি দলের হাত বদল হয়ে যে ইসলাম এদেশে স্থিতি লাভ করে, তা হয়ে পড়ে শিরক, বিদ'আত ও বিভিন্ন কুসংস্কারে ভরা জগাখিচুড়ী ইসলাম। বলা বাহুল্য যে, আজও সে অবস্থার তেমন কোন পরিবর্তন হয়নি।

ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর নীতিঃ ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) তাঁর রায়-এর তাক্বলীদ বা অন্ধ অনুসরণ করার বিরুদ্ধে তীব্রভাবে নিষেধ করে গিয়েছেন এবং 'যখন ছহীহ হাদীছ পাওয়া যাবে তখন সেটাই আমার মাযহাব' বলে দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা দিয়ে গিয়েছেন *(দ্রঃ টীকা ৩)*। সেকারণ আব্দুল ওয়াহ্হাব শা'রানী হানাফী (৮৯৮-৯৭৩ হিঃ) বলেন,

إِنَّهُ لَوْ عَاشَ حَتَّى دُوِّنَتْ أَحَادِيْثُ الشَّرِيْعَةِ.... لَأَخَذَ بِهَا وَ تَرَكَ كُلَّ قِيَاسٍ كَانَ قَاسَهُ وَ كَانَ الْقِيَاسُ قَلَّ فِيْ مَذْهَبِهِ كَمَا قَلَّ فِيْ مَذْهَبِ غَيْرِهِ...

'যদি (তৃতীয় শতাব্দী হিজরীতে) হাদীছ সংগ্রহ ও সংকলনের স্বর্ণযুগে ইমাম আবু হানীফা বেঁচে থাকতেন, তাহ'লে তিনি সেগুলি গ্রহণ করতেন ও যত ক্বিয়াসী ফৎওয়া দিয়েছেন সবই বাদ দিতেন এবং তাঁর মাযহাবেও ক্বিয়াস কম হ'ত, যেমন অন্যদের মাযহাবে কম হয়েছে। .... যে কথা বলা হয়ে থাকে যে, ইমাম আবু হানীফা ক্বিয়াসকে দলীলের উপরে স্থান দিতেন, এটা তাঁর মুক্বাল্লিদগণের কথা মাত্র। যারা ইমামের ক্বিয়াসের উপরে আমল করাকে অপরিহার্য গণ্য করেছেন এবং হাদীছকে পরিত্যাগ করেছেন যা ইমামের মৃত্যুর পরে ছহীহ প্রমাণিত হয়েছে। এ ব্যাপারে ইমাম দায়ী

---

৩৫. *শাহ অলিউল্লাহ, 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ' (কায়রোঃ দারুত তুরাছ, ১ম সংস্করণ ১৩৫৫/১৯৩৬) ১/১৪৯পৃঃ, 'আহলুল হাদীছ ও আহলুর রায়-এর পার্থক্য' অনুচ্ছেদ।*

৩৬. *শাহ অলিউল্লাহ, হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ ১/১৪৬ 'ফক্বীহদের মাযহাবী পার্থক্যের কারণ সমূহ' অনুচ্ছেদ।*

৩৭. *মুক্বাদ্দামা শারহু বেক্বায়াহ (দেউবন্দ ছাপাঃ তাবি) পৃঃ ৩৮।*

নন, বরং দায়ী তার অন্ধ অনুসারীবৃন্দ'।[৩৮]

ফলকথা আহলুল হাদীছগণের বিপরীতে আহলুর রায়গণের ক্বিয়াস স্ব স্ব মাযহাবী বিদ্বানদের রচিত ব্যবহারিক আইনসূত্র সমূহ বা উছূলে ফিক্বহের উপরে ভিত্তিশীল, হাদীছের উপরে নয়।

মুজতাহিদগণের বিভক্তিঃ

হিজরী ষষ্ঠ শতকের খ্যাতনামা বিদ্বান আবুল ফাৎহ মুহাম্মাদ বিন আবদুল করীম শহরস্তানী (৪৭৯-৫৪৮ হিঃ) বলেন,

ثُمَّ الْمُجْتَهِدُوْنَ مِنْ أَئِمَّةِ الْأُمَّةِ مَحْصُوْرُوْنَ فِيْ صِنْفَيْنِ لاَ يَعْدُوَانِ إِلَى ثَالِثٍ : أَصْحَابُ الْحَدِيْثِ وَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ، أَصْحَابُ الْحَدِيْثِ وَ هُمْ أَهْلُ الْحِجَازِ... وَ إِنَّمَا سُمُّوْا أَصْحَابَ الْحَدِيْثِ لأَنَّ عِنَايَتَهُمْ بِتَحْصِيْلِ الْأَحَادِيْثِ وَ نَقْلِ الْأَخْبَارِ وَ بِنَاءِ الْأَحْكَامِ عَلَى النُّصُوْصِ وَ لاَ يَرْجِعُوْنَ إِلَى الْقِيَاسِ الْجَلِيِّ وَ الْخَفِيِّ مَا وَجَدُوْا خَبَرًا أَوْ أَثَرًا- وَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ وَ هُمْ أَهْلُ الْعِرَاقِ هُمْ أَصْحَابُ أَبِيْ حَنِيْفَةَ النُّعْمَانِ بْنِ الثَّابِتِ... وَ إِنَّمَا سُمُّوْا أَصْحَابَ الرَّأْيِ لأَنَّ أَكْثَرَ عِنَايَتِهِمْ بِتَحْصِيْلِ وَجْهِ الْقِيَاسِ وَالْمَعْنِي الْمُسْتَنْبَطِ مِنَ الْأَحْكَامِ وَ بِنَاءِ الْحَوَادِثِ عَلَيْهَا وَ رُبَّمَا يُقَدِّمُوْنَ الْقِيَاسَ الْجَلِيَّ عَلَى آحَادِ الْأَخْبَارِ-

'উম্মতের মুজতাহিদ ইমামগণ দু'ভাগে বিভক্ত, তৃতীয় কোন ভাগে নয়। আছহাবুল হাদীছ ও আছহাবুর রায় (আহলুল হাদীছ ও আহলুর রায়)। আহলুল হাদীছগণ হেজায (মক্কা-মদীনা)-এর অধিবাসী। তাঁদেরকে 'আহলুল হাদীছ' এ জন্য বলা হয় যে, তাঁদের সার্বিক লক্ষ্য নিয়োজিত থাকে হাদীছ সংগ্রহের প্রতি এবং তাঁরা সমস্ত আদেশ-নিষেধের ভিত্তি রাখেন (কুরআন-হাদীছের) দলীল সমূহের উপরে। হাদীছ বা আছার পেলে তাঁরা কোন প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য ক্বিয়াসের দিকে ফিরে তাকান না...। পক্ষান্তরে আহলুর রায়গণ হলেন ইরাকের অধিবাসী। তাঁরা আবু হানীফা নু'মান ইবনু ছাবিত (৮০-১৫০ হিঃ)-এর অনুসারী। তাঁদেরকে 'আহলুর রায়' এ জন্য বলা হয়ে থাকে যে, তাঁদের অধিকতর লক্ষ্য থাকে ক্বিয়াসের কারণ অনুসন্ধানের প্রতি ও কুরআন-হাদীছের আহকাম হতে সৃষ্ট মর্মার্থের প্রতি এবং তার উপরেই তাঁরা উদ্ভূত ঘটনাসমূহের ভিত্তি স্থাপন করেন। কখনো কখনো তাঁরা 'খবরে ওয়াহেদ' পর্যায়ের হাদীছের উপরে প্রকাশ্য ক্বিয়াসকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকেন'।[৩৯]

আহলুল হাদীছের নীতির সপক্ষে মত প্রকাশ করতে গিয়ে হিজরী পঞ্চম শতকের ইউরোপীয় বিদ্বান স্পেনের আবু মুহাম্মাদ আলী ইবনু হায্ম আন্দালুসী (মৃঃ ৪৫৬ হিঃ) দ্ব্যর্থহীনভাবে বলেন- 'ছাহাবা, তাবেঈন ও তাবে-তাবেঈন-এর প্রথম হ'তে শেষ পর্যন্ত সকলের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত বা ইজমা এই যে, তাঁদের কোন একজন ব্যক্তির সকল কথার প্রতি কর্ণপাত করা চলবে না। অতএব ঐ ব্যক্তি জেনে রাখুক, যে ব্যক্তি আবু হানীফার সকল কথা গ্রহণ করেছে, কিংবা মালেক, শাফেঈ বা আহমাদের সকল কথাকে গ্রহণ করেছে। তাঁদের কোন কথা ছাড়েনি বা অন্যের কথার প্রতি দৃকপাত করেনি, কুরআন ও সুন্নাহ্র আদেশ-নিষেধের প্রতিও ভ্রুক্ষেপ করেনি, ঐ ব্যক্তি নিঃসন্দেহে ইজমায়ে উম্মতের বিরোধিতা করেছে। এ নীতির অনুসারী কোন লোক ছাহাবা, তাবেঈন ও তাবে-তাবেঈনের তিনটি প্রশংসিত যুগে ছিল না। ঐ ব্যক্তি মুমিনদের গৃহীত পথের বাইরে গিয়েছে। আল্লাহ পাক আমাদেরকে ঐ অবস্থা হতে পানাহ দিন'।[৪০]

এক্ষণে আমাদেরকে ভেবে দেখতে হবে আমরা আল্লাহ-প্রেরিত 'অহি' পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ভিত্তিতে জীবন সমস্যার সমাধান নেব? না মানব রচিত ফিক্বহের ভিত্তিতে সমাধান নেব। আমরা বুখারী, মুসলিম, আবুদাঊদ, নাসাঈকে অগ্রাধিকার দেব? নাকি পরবর্তীতে সৃষ্ট একটি নির্দিষ্ট মাযহাবী ফিক্বহগ্রন্থ কুদূরী, শরহে বেকায়া, হেদায়াহ, আলমগীরীকে অগ্রাধিকার দেব। আমরা কি হাদীছপন্থী হব, নাকি রায়পন্থী হব? জানা আবশ্যক যে, নবীদের আগমন শেষ হয়ে গেছে, অহি-র অবতরণ বন্ধ হয়ে গেছে। কুরআন ও ছহীহ হাদীছের কোন পরিবর্তন নেই। কিন্তু যুগে যুগে 'রায়'-এর পরিবর্তন ঘটেছে, আজও ঘটছে, ভবিষ্যতেও ঘটবে। বর্তমানে মুসলিম তরুণ সমাজ ক্রমেই বিজাতীয়দের রায়ের অনুসারী হয়ে পড়ছে। ফলে নানা মুণীর নানা মতে মুসলিম সমাজ আজ শতধা বিভক্ত। বিশৃংখল এই বিরাট উম্মতকে ঐক্যবদ্ধ ও কল্যাণমুখী করার একটাই মাত্র পথ। সেটা হ'লঃ সবদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্র দিকে ফিরে চলা। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ফয়ছালার সম্মুখে নিঃশর্তভাবে আত্মসমর্পণ করা। যুগ যুগ ধরে আহলেহাদীছ আন্দোলন এই কল্যাণ লক্ষ্যেই পরিচালিত হয়ে এসেছে, আজও হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও হবে ইনশাআল্লাহ।

[চলবে]

৩৮. আব্দুল ওয়াহহাব শা'রানী, মীযানুল কুবরা (দিল্লী ছাপাঃ ১২৮৬ হিঃ) ১/৭৩ পৃঃ।

৩৯. মুহাম্মাদ বিন আব্দুল করীম শহরস্তানী, কিতাবুল মিলাল ওয়ান নিহাল (বৈরুতঃ দারুল মা'রিফাহ, তাবি) ২০৬-২০৭ পৃঃ।

৪০. শাহ অলিউল্লাহ, হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ (মিসরী ছাপা ১৩২২ হিঃ) ১/১২৩-১২৪ পৃঃ।

নির্ভেজাল তাওহীদের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে কিতাব ও সুন্নাতের যথাযথ অনুসরণের মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করা। আক্বীদা ও আমলের সংশোধনের মাধ্যমে সমাজের সার্বিক সংস্কার সাধন আহলেহাদীছ আন্দোলনের সামাজিক ও রাজনৈতিক লক্ষ্য।

তাফসীরুল কুরআনঃ কিছু কথা

ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

(২য় কিস্তি)

১০. কুরআন আল্লাহ্‌র কালাম (القرآن كلام الله) গুণঃ

যুখরুফ ৩ (إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا) 'আমরা উহা অবতীর্ণ করেছি আরবী ভাষায় কুরআন রূপে'।

মাননীয় তাফসীরকার উক্ত আয়াতের তাফসীর করেছেন (أوجدنا الكتاب بلغة العرب) 'আমরা আরবদের ভাষায় কুরআনকে অস্তিত্বশীল করেছি'।

এই তাফসীর সম্পূর্ণ বাতিল। মাননীয় তাফসীরকার এখানে (তাফসীরে কাশ্‌শাফ-এর রচয়িতা) আল্লামা যামাখ্‌শারীর (৪৬৭-৫৩৮হিঃ) দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। যামাখ্‌শারী একজন জাহ্‌মী মু'তাযেলী। তিনি অত্র আয়াতের তাফসীর করেছেন (أى خلقناه) 'আমরা উহাকে সৃষ্টি করেছি'।

['নাঊযুবিল্লাহ'। কুরআন আল্লাহ্‌র কালাম, যা আল্লাহ্‌র ন্যায় আদি ও সনাতন। উহা সৃষ্ট নহে। কেননা প্রত্যেক সৃষ্টিরই ধ্বংস রয়েছে। শুরু ও শেষ রয়েছে। কিন্তু 'আল্লাহ্‌র কালাম' ধ্বংসশীল নয়। জাহ্‌মী, মু'তাযেলী প্রভৃতি নির্গুণবাদীগণ কুরআনকে 'মাখলূক্ব' বা সৃষ্ট বলে থাকেন- যা আহলে সুন্নাত-এর আক্বীদার সম্পূর্ণ বিপরীত একটি বাতিল মতবাদ মাত্র।]

অথচ উক্ত আয়াতের যথার্থ অর্থ হবে তাই-ই যা ইমাম ইবনু জারীর ও হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) প্রমুখ বিদ্বানগণ করেছেন। অর্থাৎ (أى أنزلناه...) 'আমরা উহাকে অবতীর্ণ করেছি...'।

১১. আল্লাহ্‌র নাম (اسم الله)ঃ

ওয়াক্বি'আহ-৭৪ (فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ) 'সুতরাং তুমি তোমার মহান প্রতিপালকের নামের মহত্ত্ব ঘোষণা কর'। মাননীয় তাফসীরকার এর ব্যাখ্যায় বলেন, (وقيل: باسم زائد) 'বলা হয়ে থাকে যে, اسم বা 'নাম' কথাটি অতিরিক্ত'।

আমরা বলি যে, اسم শব্দটি 'অতিরিক্ত' না হওয়াটাই সঠিক। ইবনু জারীর (রহঃ) এই আয়াতের তাফসীরে বলেন, (فسبح بتسمية ربك العظيم بأسمائه الحسنى) 'সুতরাং তুমি তোমার মহান প্রতিপালকের নামের মহত্ত্ব তাঁর সুন্দরতম নাম সমূহ দ্বারা ঘোষণা কর'।

১২. আল্লাহ্‌র বাণী সমূহ (كلمات الله) গুণঃ

লুক্বমান-২৭ (مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ) 'পৃথিবীর সমস্ত বৃক্ষ যদি কলম হয় এবং বর্তমানের সমুদ্রের সাথে আরও সাতটি সমুদ্র যুক্ত হয়ে কালি হয়, তথাপি আল্লাহ্‌র বাণীসমূহ নিঃশেষিত হবে না'...'। মাননীয় তাফসীরকার উক্ত আয়াতাংশের নিম্নোক্ত তাফসীর করেছেন (اَلْمُعَبَّرُ بِهَا عَنْ مَعْلُوْمَاتِهِ) 'তাঁর জ্ঞাত বিষয় সমূহ হ'তে যা প্রকাশিত হয়েছে' (তা নিঃশেষিত হবে না)।

এখানে (كَلِمَاتُ اللَّهِ) অর্থাৎ 'আল্লাহ্‌র বাণী সমূহের' তাফসীর 'তাঁর জ্ঞাত বিষয়সমূহ' দ্বারা করা পূর্ববর্তী বিদ্বানগণের বুঝের সম্পূর্ণ বরখেলাফ। সেই সাথে এটা প্রকাশ্য অর্থ হ'তে বেরিয়ে যাবার শামিল। অথচ (كَلِمَاتُ اللَّهِ। অর্থ আল্লাহ্‌র বাণীসমূহ- যার কোন শেষ নেই। কারণ তিনি আদি সত্তা যার কোন শুরু নেই। তিনিই চূড়ান্ত সত্তা যার কোন শেষ নেই। তিনি সর্বদা আছেন ও সর্বদা থাকবেন। যখন ইচ্ছা যা খুশী কথা বলবেন। বিগত দিনেও তাঁর কথা বলার কোন শেষ ছিল না, আগামী দিনেও থাকবে না। তাঁর সকল বাণী লিপিবদ্ধ করার সাধ্য বৃক্ষ ও সমুদ্রের নেই। এক্ষণে (كَلِمَاتُ اللَّهِ)-এর তাফসীর (مَقْدُوْرَاتُهُ) অর্থাৎ তাঁর 'কুদরত সমূহ' কিংবা (مَعْلُوْمَاتُهُ) অর্থাৎ 'জ্ঞাত বিষয়সমূহ' দ্বারা করলে তা কেবল বাস্তব ও জ্ঞাত বিষয় সমূহকে শামিল করে। অথচ আল্লাহ্‌র বাণীসমূহ বিগত ও অনাগত সকল সময়ের জন্য এবং সমাপ্তিহীন'।

অতএব মাননীয় তাফসীরকারের অত্র ব্যাখ্যা 'আল্লাহ্‌র কালাম' সম্পর্কে আশ'আরী মাযহাব ও হানাফী মাতুরীদী মাযহাবের দিকে ফিরে যায়। কেননা তাঁদের দৃষ্টিতে আল্লাহ্‌র কালাম (معنى واحدٌ نفسىٌّ قديمٌ فلا يوصف بالتعدد) 'একটি একক আত্মিক ও সনাতন বিষয়- যা বারবার ঘটার গুণযুক্ত নয়'।

বলা বাহুল্য তাঁদের এই মতবাদ আহলেসুন্নাত ওয়াল জামা'আতের গৃহীত মাযহাবের বিরোধী। কেননা তাঁরা বলেন যে, আল্লাহ পাক যখন যা খুশী যেভাবে খুশী কথা বলবেন। তার কোন সীমা নির্দেশ নেই। তিনি বলেছেন ও বলবেন, তিনি আহ্বান করেছেন ও করবেন, যেমন আল্লাহ নিজেই সে কথা বলেছেন। আর তাঁর সম্পর্কে তিনি নিজেই অন্যের চেয়ে ভাল জানেন। তিনিই সত্যবাদী ও তাঁর সৃষ্টির

চেয়ে সুন্দর বক্তব্য দানকারী।

১৩. আল্লাহ্র ভালবাসা (صفة الحب) গুণঃ

(১) বাক্বারাহ ১৯৫ (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ) 'নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালবাসেন'। মাননীয় তাফসীরকার এর ব্যাখ্যা করেছেন (اى يُثِيْبُ وَ يُكْرِمُ) 'তাকে ছওয়াব দিবেন'। এখানে মাননীয় তাফসীরকার আল্লাহ্র 'ভালবাসা' গুণকে বাতিল করে তার আবশ্যিক ফল 'ছওয়াব'-কে উল্লেখ করেছেন। অথচ আল্লাহ্র 'ভালবাসা'-ই হ'ল মূল বিষয়। তিনি কাউকে ভালবাসলে তার প্রতিদান তিনি কিভাবে দিবেন, সেটা তাঁর ইচ্ছা। তিনি ছওয়াব ও সম্মান প্রদানের মাধ্যমে ভালবাসবেন, না তাকে কষ্ট দিয়ে পরীক্ষার মাধ্যমে ভালবাসবেন, সে বিষয়ে বান্দার কোন এখতিয়ার নেই। অতএব তাঁর ভালোবাসাকে 'ছওয়াব' বা 'সম্মানে'র সাথে নির্দিষ্ট করা আয়াতের প্রকাশ্য অর্থ পরিবর্তনের শামিল। যা আহলেসুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আক্বীদার বিরোধী এবং নির্গুণবাদীদের অনুকরণ মাত্র।

মাননীয় তাফসীরকার কুরআনের সর্বত্র আল্লাহ্র 'ভালবাসা' গুণকে বিভিন্ন রূপক অর্থে ব্যাখ্যা করেছেন। যেমন বাক্বারাহ ২২২; আলে ইমরান ৩১, ৭৬, ১৩৪, ১৪৬; মায়েদাহ ৪২, ৯৪; তাওবাহ ১০৮; ছফ ৪ প্রভৃতি।

(২) ছফ-৪ঃ (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِهِ) 'নিশ্চয়ই আল্লাহ ভালবাসেন ঐসব লোকদেরকে যারা তাঁর রাস্তায় লড়াই করে..)।

এখানে মাননীয় তাফসীরকার 'ভালবাসার' অর্থ করেছেন 'সাহায্য করা ও সম্মান করা' (إن الله يُحِبُّ، يَنْصُرُ وَيُكْرِمُ) দিয়ে। আমরা বলি যদি এটাকে তিনি 'মহব্বত'-এর তাফসীর গণ্য করে থাকেন, তবে তা নিঃসন্দেহে (تعطيل) বা নির্গুণবাদীতার পরিচায়ক। পক্ষান্তরে যদি তিনি আল্লাহ্র 'ভালোবাসা' গুণ-এর স্বীকৃতি দিয়ে এগুলিকে তাঁর মহব্বত-এর নিদর্শন ও আবশ্যিক ফল (ملزوم) বলে মনে করেন তাহ'লে ঠিক আছে। কেননা আল্লাহ যখন কোন বান্দাকে ভালবাসেন, তখন তাকে সম্মানিত করেন, সাহায্য করেন ও উত্তম বদলা দান করেন।

১৪. আল্লাহ্র ক্রোধ (صفة الغضب) গুণঃ

বাক্বারাহ ২৭৬ (وَاللَّهُ لاَيُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيْمٍ) 'আল্লাহ কোন কাফের ও পাপীকে ভালবাসেন না'। এখানে মাননীয় তাফসীরকার 'আল্লাহ ভালবাসবেন না' অর্থ করেছেন (اى يُعَاقِبُهُ) 'তাকে শাস্তি দিবেন'। অথচ এর প্রকৃত অর্থ হ'ল, আল্লাহ্র ভালোবাসা না থাকার পরিণাম স্বরূপ তিনি তাকে বদলা বা শাস্তি দিবেন। এখানে আল্লাহ্র صفة الغضب বা 'ক্রোধ' গুণকে তার প্রকাশ্য অর্থ থেকে সরিয়ে তার আবশ্যিক ফল হিসাবে 'বদলা' বা 'শাস্তি' করা হয়েছে। যা মূল অর্থ পরিবর্তন করার শামিল। কেননা আল্লাহ্র রহমত তাঁর ক্রোধের উপরে বিজয়ী। অতএব তিনি কাউকে শাস্তি দিতে বাধ্য নন। এটি যুক্তিবাদী মু'তাযিলাদের ভ্রান্ত আক্বীদা মাত্র।

এভাবে কুরআনের সর্বত্র আল্লাহ্র 'ক্রোধ' গুণকে রূপক অর্থে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যেমন আলে ইমরান ৩২, ৫৮, ১৪০; নিসা ১০৭, ১৪৮; মায়েদাহ ৬৪; নাহ্ল ২৩; হজ্জ ৩৮; ক্বাছাছ ৭৭; রূম ৪৫; শূরা ৪০ প্রভৃতি।

১৫. আল্লাহ্র কৌশল (صفة المكر) গুণঃ

ইউনুস ২১ (قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا) 'বলে দিন যে, আল্লাহ সর্বাপেক্ষা দ্রুত কুশলী'। মাননীয় তাফসীরকার এখানে অর্থ করেছেন (مُجَازَاةً) 'বদ্লা দানকারী'।

[ই,ফা,বা, এখানে কাছাকাছি একই অর্থ করেছে 'শাস্তিদানে দ্রুততর' (পৃঃ ৩১৪)। অথচ مكر অর্থ 'শাস্তি' নয় বরং 'কৌশল'। আল্লাহ কোন্ কৌশল বান্দার প্রতি অবলম্বন করবেন, সেটা তিনিই ভাল জানেন। বান্দাকে শাস্তির বদলে অন্য কৌশলে তিনি হেদায়াত করতে পারেন কিংবা বদলা দিতে পারেন। এখানে 'কৌশল' মুখ্য, শাস্তি কিংবা 'বদলা দান' মুখ্য নয়।]

বস্তুতঃ এখানে কৌশলের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য হ'ল পাপীর উপরে শাস্তি নাযিল করার এমন এক সুষ্ঠু পদ্ধতি, যাতে সে বুঝতে না পারে। কেননা উক্ত বদ্লা দান একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে হয়ে থাকে। আল্লাহ্র পক্ষ থেকে কৌশল হয়ে থাকে প্রতারকের বুকের উপরে তার প্রতারণাকে ফিরিয়ে দেবার জন্য এবং তার সাথে প্রতিশোধ নাযিল করার জন্য এমনভাবে, যে সে বুঝতে না পারে। তার বদ্লা হয়ে থাকে তার কর্ম ও নিয়ত অনুযায়ী। এটাও জেনে রাখা ওয়াজিব যে, উক্ত আয়াতের মর্মার্থ অনুযায়ী আল্লাহ্র নাম হিসাবে مَاكِرٌ বা প্রতারণাকারী (নাঊযুবিল্লাহ) বলা চলে না। বরং তাঁকে خَيْرُ الْمَاكِرِيْنَ বা 'কৌশলকারীদের সেরা' বলা হবে। অতএব ব্যাখ্যাকারীকে কুরআনে উল্লেখিত সীমারেখায় দাঁড়িয়ে যেতে হবে, যাতে আল্লাহ যা বলেননি সেরূপ কোন বিষয় তাঁর দিকে সম্পর্কিত হয়ে যাবার ধারণা সৃষ্টি না হয়।

১৬. আল্লাহ্‌র উপহাস (صفة الاستهزاء) গুণঃ

বাক্বারাহ ১৫ (اَللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ) 'আল্লাহ তাদের সাথে উপহাস করেন'। মাননীয় তাফসীরকার এর ব্যাখ্যা করেছেন, (يجازيهم بإ ستهزائهم) 'তাদের বদলা দিবেন তাদের সাথে উপহাসের মাধ্যমে'। এখানে মূল অর্থ ঠাট্টা বা উপহাস বাদ দিয়ে 'বদলা দান' অর্থ করা প্রকাশ্য অর্থ থেকে সরে যাবার শামিল। কেননা মূল অর্থ ঠিক রাখার মাধ্যমে একথাই বুঝানো হবে যে, আল্লাহ তাঁর উপহাসকারীর সাথে অনুরূপ আচরণ করতে পারেন অথবা তার চাইতে কঠোর আচরণ করতে পারেন বা অন্যভাবেও উপহাসের জবাব দিতে পারেন। কিভাবে তিনি সেটা করবেন, তা সম্পূর্ণরূপে তাঁর এখতিয়ারাধীন। এখানে 'বদলা দান' অর্থ করার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র 'উপহাস' গুণকে বাতিল গণ্য করা হয়েছে।

১৭. আল্লাহ্‌র প্রতারণা (صفة الخداع) গুণঃ

নিসা ১৪২ (إِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَهُوَخَادِعُهُمْ) 'নিশ্চয়ই মুনাফিকরা আল্লাহকে ধোঁকা দিতে চায়। অথচ তিনিই তাদেরকে প্রতারিত করে থাকেন'। মাননীয় তাফসীরকার এর ব্যাখ্যা করেছেন, (مجازيهم على خداعهم) 'তাদের প্রতারণার বিনিময়ে শাস্তি দিবেন'। এখানে মূল অর্থ থেকে সরে গিয়ে 'শাস্তি দান' অর্থ করা হয়েছে। অথচ আল্লাহ্‌র প্রতারণার ধরণ কেমন হবে, তা কারু জানা নেই। এখানে আল্লাহ্‌র 'প্রতারণা' গুণকে বাতিল করা হয়েছে।

১৮. নূরে মুহাম্মাদী (نور محمدى) ঃ

মায়েদাহ ১৫ (قَدْجَاءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌوَّ كِتَابٌ مُّبِيْنٌ) 'আল্লাহ্‌র নিকট থেকে একটি জ্যোতি ও স্পষ্ট কিতাব তোমাদের নিকটে এসেছে'। এখানে 'জ্যোতি' অর্থ হ'ল نور فى الهداية বা 'হেদায়াতের জ্যোতি'। কিন্তু মাননীয় তাফসীরকার আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী এখানে ব্যাখ্যা করেছেন, هو النبى صـ 'জ্যোতি হ'ল মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম'। এটা চরমপন্থী শী'আ ও ভণ্ড ছূফীদের ভ্রান্ত আক্বীদা বৈ কিছুই নয়। যারা মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে 'আল্লাহ্‌র নূর' বলে থাকে। যারা বলে, আল্লাহ স্বীয় নূর থেকে মুহাম্মাদকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর মুহাম্মাদের নূর থেকে সকল বস্তু সৃষ্টি করেছেন'। এখান থেকে এদেশে কথা চালু হয়ে গেছে যে, 'আল্লাহ্‌র নূরে মুহাম্মাদ পয়দা। মুহাম্মাদের নূরে সারা জাহান পয়দা'।

১৯. আরশ ও কুরসী (العرش و الكرسى) ঃ

তাওবাহ ১২৯ (وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ) 'তিনি মহান আরশের অধিপতি'। মাননীয় তাফসীরকার এখানে অর্থ করেছেন (اى الكرسى) 'কুরসী' বা আসন। আল্লাহ এটিকে খাছ করে বলেছেন এজন্য যে, এটিই হ'ল সৃষ্টিকুলের সেরা'। অথচ এটি হাসান বাছরী (রহঃ)-এর নিজস্ব 'রায়' মাত্র। হাফেয ইবনু কাছীর (৭০১-৭৭৪হিঃ) বলেন, الصحيح أن الكرسى غير العرش والعرش أكبر منه كما دلت عليه الآثار والأخبار– 'আরশ' কুরসীর চাইতে বড়। যা বিভিন্ন হাদীছ ও আছার দ্বারা প্রমাণিত' *(ঐ, তাফসীর বাক্বারাহ ২৫৫, ১/৩১৭)*। একই ভাবে 'কুরসী' অর্থ করা হয়েছে 'মু'মিনূন' ১১৬ আয়াতে।

২০. আল্লাহ্‌র চেহারা (صفة الوجه) গুণঃ

(১) বাক্বারাহ ১১৫ (فَاَيْنَمَاتُوَلُّوْافَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ) 'অতঃপর যেদিকেই তোমরা মুখ ফিরাও না কেন, সেদিকেই রয়েছে আল্লাহ্‌র চেহারা'। মাননীয় তাফসীরকার এখানে অর্থ করেছেন (اى قِبْلَتُهُ) 'তার ক্বিবলা'। এর ফলে তিনি 'আল্লাহ্‌র চেহারা' গুণকে অস্বীকার করেছেন। যা ছাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে ছালেহীনের ব্যাখ্যার সম্পূর্ণ বিপরীত। এটি নির্গুণবাদী ভ্রান্ত ফির্কা মু'আত্ত্বিলাহদের অনুকরণ মাত্র। আর এখান থেকেই এদেশে 'আল্লাহ নিরাকার' মতবাদের সৃষ্টি হয়েছে। এমনিভাবে কুরআনে যেখানেই وجه الله বা 'আল্লাহ্‌র চেহারা' মর্মের আয়াত এসেছে, সেখানে উক্ত গুণকে অস্বীকার করে বিভিন্ন রূপক অর্থ করা হয়েছে, যা নির্গুণবাদী মু'তাযিলাদের অনুকরণ মাত্র। যেমন বাক্বারাহ ২৭২; রূম ৩৮, ৩৯; রহমান ২৭; দাহ্‌র ৯; লায়ল ২০ প্রভৃতি।

[ই,ফা,বা, এখানে অর্থ করেছে, 'যেদিকেই তোমরা মুখ ফিরাও না কেন, সেদিকেই আল্লাহ্‌র দিক' (ঐ, পৃঃ ২৯)। এটি হয় অনুকরণ নতুবা ভ্রান্ত আক্বীদার বহিঃপ্রকাশ মাত্র।]

(২) ক্বাছাছ ৮৮ (كُلُّ شَيْئٍ هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ) অর্থঃ 'সবকিছু ধ্বংস হবে তাঁর চেহারা ব্যতীত'। মাননীয় তাফসীরকার এর অর্থ করেছেন (إِلاَّ إِيَّاهُ) 'তিনি ব্যতীত'। আল্লাহ পাক সম্মানিত তাফসীরকারকে ক্ষমা করুন, তিনি আল্লাহ্‌র 'চেহারা' গুণ-এর অর্থ 'সত্তা' দ্বারা পরিবর্তন করেছেন। এটা (تعطيل واضح) বা পরিষ্কারভাবে নির্গুণবাদিতার শামিল। নিঃসন্দেহে 'চেহারা' আল্লাহ পাকের

অন্যতম যথাযোগ্য গুণ যা সত্তার আবশ্যিকতাকে নির্দেশ করে।

অতএব 'সত্তা' (لازم)-কে মেনে নেওয়া ও 'চেহারা' (ملزوم)-কে অস্বীকার করা সিদ্ধ নয়। বরং সত্তা ও চেহারা দু'টিকেই প্রমাণিত করা ওয়াজিব।

[ই,ফা,বা, এখানে তরজমা করেছে 'আল্লাহ্র সত্তা ব্যতীত সমস্ত কিছুই ধ্বংসশীল' (পৃঃ ৬৪০)। এখানে মু'তাযেলীদের অনুকরণে আল্লাহ্র 'চেহারা' গুণকে অস্বীকার করা হয়েছে, যা মারাত্মক ভ্রান্তি। অথচ 'চেহারা' অর্থ করলে 'সত্তা' আপনা থেকেই এসে যায়।]

২১. আল্লাহ্র চক্ষু (صفة العين) গুণঃ

ত্বা-হা ৩৯ (وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِيْ) 'এবং যাতে তুমি আমার চোখের সম্মুখে প্রতিপালিত হও'। এখানে মাননীয় তাফসীরকার আল্লামা জালালুদ্দীন মাহাল্লী (عَلَى عَيْنِيْ) 'চোখের সম্মুখে' অর্থ করেছেন على رعايتى 'আমার তত্ত্বাবধানে'। এর দ্বারা তিনি 'আল্লাহ্র চক্ষু' ও দর্শন গুণকে তাবীল করেছেন। 'আল্লাহ্র দু'টি চক্ষু' সম্পর্কিত আক্বীদা কিতাব ও সুন্নাহ্ দ্বারা প্রমাণিত এবং সালাফে ছালেহীন দ্বারা ব্যাপকভাবে সমাদৃত।

[ই,ফা,বা, এখানে তরজমা করেছে (পৃঃ ৪৯৪) 'যাহাতে তুমি আমার তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হও'। এ অনুবাদ আহলেসুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আক্বীদা বিরোধী।]

২২. আল্লাহ্র শ্রবণ ও দর্শন (السميع والبصير) গুণঃ

ইসরা ১ (إِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ) 'নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা'। এখানে মাননীয় তাফসীরকার আল্লামা সুয়ূত্বী ব্যাখ্যা করেছেন, العالم بأقوال النبى وأفعاله 'তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কথা ও কর্মসমূহ সম্পর্কে অবগত'। অথচ আল্লাহ্র 'শ্রবণ ও দর্শন' গুণ দু'টিকে কেবল 'ইল্ম'-এর দ্বারা তাবীল করার বিষয়টি অস্পষ্ট। এর দ্বারা মাননীয় তাফসীরকার আল্লাহ্র উক্ত গুণ দু'টিকে প্রকারান্তরে অস্বীকার করতে চেয়েছেন, যা নির্গুণবাদী মু'আত্ত্বিলাহদের আক্বীদার অনুরূপ।

২৩. আল্লাহ্র হাত (صفة اليد) গুণঃ

(১) আলে ইমরান ২৬ (بِيَدِكَ الْخَيْرُ) 'আপনার হাতেই যাবতীয় কল্যাণ'। মাননীয় তাফসীরকার এখানে بِيَدِكَ 'আপনার হাতে' অর্থ করেছেন بقدرتك 'আপনার কুদরতে'। যা আল্লাহ্র 'হাত' গুণকে অস্বীকার করার শামিল। অথচ এটি পবিত্র কুরআন ও অসংখ্য ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। 'হাত' গুণটিকে আল্লাহ্র সত্তার সাথে যুক্ত করলে তাঁর সত্তা ও কুদরত সবকিছুকে শামিল করে। কিন্তু মাননীয় তাফসীরকার এখানে স্রেফ কুদরত বা ক্ষমতা গুণকে নির্দিষ্ট করে আল্লাহকে পরোক্ষভাবে শূন্য সত্তা প্রমাণ করতে চেয়েছেন, যা নাস্তিকদের আক্বীদাকে সমর্থন করে। অনুরূপভাবে কুরআনে সর্বত্র 'আল্লাহ্র হাত' গুণের বিভিন্ন রূপক অর্থ করা হয়েছে। যেমন মায়েদাহ ৬৪; ফাৎহ ১০; ইয়াসীন ৮৩; ছোয়াদ ৭৫; যুমার ৬৭; মুল্ক ১ প্রভৃতি।

(২) মুল্ক-১ (تَبَارَكَ الَّذِيْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ) 'মহিমান্বিত তিনি যাঁর হাতেই সকল রাজত্ব'।

মাননীয় তাফসীরকার (بِيَدِهِ) অর্থাৎ 'তাঁর হাত'-এর তাফসীর করেছেন (بيده: فى تصرفه) 'তাঁর পরিচালনায়'। এর দ্বারা তিনি আল্লাহ্র 'হাত' থাকার গুণকে অস্বীকার করেছেন ও প্রকাশ্য অর্থ হ'তে সরে এসেছেন। সাথে সাথে পূর্ববর্তী বিদ্বানগণের ব্যাখ্যার বিরোধিতা করেছেন। ইবনু জারীর বলেন, 'তাঁর হাতেই দুনিয়া ও আখেরাতের সর্বময় ক্ষমতা ও রাজত্ব যার মধ্যে তাঁর হুকুম ও ফায়ছালা কার্যকরী হয়'।

অতএব 'হাত'-এর ব্যাখ্যা অন্য কিছু দিয়ে করা উচিত নয়। কেননা আল্লাহ্র নাম ও গুণাবলীর উপরে ঈমান আনার ব্যাপারে উম্মতের প্রথম যুগের সকলের এবং তাঁদের বিদ্বানগণের সম্মিলিত ঐক্যমত রয়েছে।

(৩) মায়েদাহ ৬৪ (بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوْطَتَانِ) 'বরং তাঁর দু'টি হাত প্রসারিত'। মাননীয় তাফসীরকার বলেন, (مبالغة فى الوصف بالجود) 'এখানে দানশীলতা গুণের আধিক্য বুঝানো হয়েছে এবং অধিক দানশীলতা বুঝানোর জন্য 'দুই হাত' কথাটি উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ কোন দানশীল ব্যক্তির চূড়ান্ত দানশীলতা তখনই বুঝানো হয়, যখন তিনি নিজ হাতে দান করেন'।

[ই,ফা,বা, এখানে ১৭৩ পৃষ্ঠা ৩৭৬নং টীকায় বলেছে, আল্লাহ্র 'হাত রুদ্ধ দ্বারা কৃপণতা বুঝানো হয়েছে'। এর দ্বারা যদি আল্লাহ্র 'হাত' গুণকে অস্বীকার করা হয়ে থাকে, তাহ'লে সেটা হবে মারাত্মক ভ্রান্তি। বরং 'হাত' এর অস্তিত্ব لازم হিসাবে প্রথমে থাকতে হবে। অতঃপর তার দানশীলতা ও কৃপণতার বিষয়টি ملزوم হিসাবে পরে আসবে।]

এতে কোন সন্দেহ নেই যে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দার উপরে তাঁর করুণা, দানশীলতা এবং দ্বীনী ও দুনিয়াবী কল্যাণ প্রসারিত করে দিয়েছেন। কিন্তু মাননীয় তাফসীরকার আল্লাহ্র 'দু'টি হাত'-এর গুণ বর্ণনা থেকে বিরত হয়েছেন বরং তার আসল অর্থ ফিরিয়ে দিয়েছেন। অথচ আহলে সুন্নাত বিদ্বানগণ এ বিষয়ে 'ইজমা' করেছেন এবং কুরআন ও সুন্নাহ থেকে বিপুলভাবে প্রমাণিত যে, প্রকৃত অর্থেই আল্লাহ্র দু'খানা হাত রয়েছে তাঁর উচ্চ মর্যাদার যোগ্য রূপে। দু'খানা হাত প্রমাণ করার জন্যই এখানে দ্বিবচন ব্যবহার করা হয়েছে। একখানা হাত নয়।

যেমন হাদীছে বর্ণিত হয়েছে (وَكِلْتَا يَدَىْ رَبِّنَا يَمِيْنٌ) 'আমাদের প্রভুর দু'খানা হাতই ডান হাত'।[৪] অতএব উক্ত আয়াতের তাফসীর উক্ত হাদীছ অনুযায়ী হওয়া ওয়াজিব। হাঁ হাতের আবশ্যিক গুণের অন্যতম হ'ল দানশীলতা। কিন্তু 'মালযূম' বা হাত-এর অর্থ বাদ দিয়ে 'লাযিম' বা দানশীলতার অর্থ গ্রহণ করা সিদ্ধ নয়। 'হাত'-এর গুণ ও তার আবশ্যিক ফল (দানশীলতা) প্রমাণ করা ওয়াজিব। কেননা আহলে সুন্নাত-এর গৃহীত নীতি হ'ল 'আল্লাহ্র নাম ও গুণাবলী এবং গুণাবলীর হুকুম সমূহের উপরে ঈমান রাখা অপরিহার্য'। এভাবে মাননীয় তাফসীরকার আল্লাহ্র 'হাত' গুণকে সর্বত্র 'রূপক' অর্থে ব্যবহার করেছেন।

(৪) ছোয়াদ ৭৫ঃ (قَالَ يَا إِبْلِيْسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ) 'তিনি (আল্লাহ) বললেন, হে ইবলীস কোন্ বস্তু তোমাকে বিরত রাখ্ল (আদমকে) সিজদা করতে, যাকে আমি আমার দু'হাত দ্বারা সৃষ্টি করেছি?' মাননীয় তাফসীরকার আল্লামা জালালুদ্দীন মাহাল্লী এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, (أى تَوَلَّيْتُ خَلْقَهُ وهذا تشريف لآدم فإن كل مخلوق تولّى الله خلقه) অর্থাৎ 'আমি তাকে সৃষ্টির জন্য দায়িত্বশীল নিয়োগ করলাম। এটি আদমের জন্য উচ্চ মর্যাদার কারণ। কেননা কোন সৃষ্টির জন্য আল্লাহ প্রত্যেক দায়িত্বশীল নিয়োগ করে থাকেন'। অর্থাৎ আল্লাহ পিতা-মাতা ছাড়াই আদমকে সরাসরি দায়িত্বশীলের মাধ্যমে সৃষ্টি করেছেন।

আমরা বলি, দুই হাত দ্বারা আদমকে সৃষ্টি করাকে দায়িত্বশীলের মাধ্যমে সৃষ্টির অর্থ করা আল্লাহ্র 'দুই হাত' থাকার গুণকে বাতিল করার শামিল। এটি প্রকাশ্য অর্থের বরখেলাফ এবং সালাফে ছালেহীন বিদ্বানগণের ব্যাখ্যার পরিপন্থী। তাছাড়া অন্যান্য সৃষ্টির ন্যায় সৃষ্টিসেরা আদমকেও দায়িত্বশীলের মাধ্যমে সৃষ্টি করার মধ্যে আদমের জন্য কোন গৌরব নেই। যদিও মাননীয় তাফসীরকার জালালুদ্দীন মাহাল্লী এটাকেই 'আদমের জন্য মর্যাদাকর' বলতে চেয়েছেন। অথচ অন্যান্য সৃষ্টির বিপরীতে আল্লাহ্র নিজ দু'হাতে তাকে সৃষ্টি করার মধ্যেই যে তার জন্য সর্বোচ্চ মর্যাদা নিহিত রয়েছে, সে কথা তিনি এড়িয়ে গেছেন। কারণ তিনি আল্লাহ্র 'দু'হাত' গুণের উপর বিশ্বাসী নহেন। অথচ প্রথম যুগের বিশ্বস্ত মুফাসসির ইমাম ইবনু জারীর ত্বাবারী (রহঃ) বলেন, এই আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ পাক খবর দিচ্ছেন যে, তিনি আদমকে নিজের দু'হাত দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। যেমন এই মর্মে হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) হ'তে তাবেঈ মুফাস্সির হযরত মুজাহিদ (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, 'আল্লাহ পাক চারটি বস্তু নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেনঃ (১) আরশ (২) জান্নাতু আদ্ন (৩) কলম ও (৪) আদম। অতঃপর অন্য সকল সৃষ্টিকে বলেন হও, ব্যস হয়ে যায়'।[৫]

যদি এখানে দুই হাত দ্বারা আদমকে সৃষ্টি না করা হ'ত, তাহ'লে সাধারণ সৃষ্টির মধ্যে তাঁর জন্য কোনরূপ বিশেষ সম্মান ও মর্যাদা প্রমাণিত হ'ত না। প্রত্যেক সৃষ্টির জন্যই আল্লাহ দায়িত্বশীল নিয়োগ করেন এবং নিজ কুদরতের মাধ্যমে তাকে সৃষ্টি করেন। আর একারণেই ঐ ব্যক্তির তাফসীর বাতিল গণ্য হচ্ছে, যিনি আদমকে দুই হাত দ্বারা সৃষ্টির তাফসীর 'কুদরত' দ্বারা কিংবা 'দায়িত্বশীল' দ্বারা বা অন্য কিছু দ্বারা তাবীল করেছেন।

[ই,ফা,বা, এখানে (পৃঃ ৭৪৮) অনুবাদ করেছে 'নিজ হাতে'। অথচ প্রকৃত অর্থ হবে 'আমার দু'হাত দ্বারা'।]

(৫) যুমার ৬৭ (وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِيْنِهِ) 'ক্বিয়ামতের দিন সমস্ত পৃথিবী থাকবে তাঁর হাতের মুষ্টিতে এবং আকাশ মণ্ডলী থাকবে তাঁর দক্ষিণ হস্তে ভাঁজ করা অবস্থায়'।

মাননীয় তাফসীরকার (وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِيْنِهِ) -এর অর্থ করেছেন (والسموات مجموعات بقدرته) 'আকাশ মণ্ডলী তাঁর কুদরতের দ্বারা একত্রে সংযুক্ত থাকবে'।

অথচ 'ডান হাত' অর্থ কখনোই 'কুদরত' নয়। এটি প্রকাশ্য অর্থের পরিবর্তন এবং সালাফে ছালেহীন মুফাস্সিরগণের বুঝের বরখেলাফ। ইবনু জারীর ত্বাবারী (রহঃ) এ আয়াতের তাফসীরে বলেন, 'সমস্ত যমীনকে আমি ক্বিয়ামতের দিন আপন মুষ্টিতে নিয়ে নেব' অর্থাৎ পৃথিবীকে উপরে উঠিয়ে নেওয়া হবে। এখানে পৃথিবী সম্পর্কিত খবর 'ক্বিয়ামতের দিন' বাক্যাংশের মাধ্যমে শেষ করা হয়েছে।

৪. মুসলিম হা/১৮২৭ 'ইমারত' অধ্যায়।

৫. যাহাবী, মুখতাছারুল 'উলু (বৈরুতঃ ১৪০১/১৯৮১) পৃঃ ১০৫।

অতঃপর আকাশ মণ্ডলী সম্পর্কে নতুন বক্তব্য শুরু হয়েছে এভাবে, (وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِيْنِهِ) অর্থাৎ এটিকেও ভাঁজ করা অবস্থায় উপরে উঠিয়ে নেওয়া হবে। ছাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও একদল ছাহাবী হ'তে বর্ণিত আছে, তাঁরা বলেন যে, 'যমীন ও আসমান সবকিছুই ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্র ডান হাতে থাকবে'। অন্যেরা বলেন, 'বরং আকাশ মণ্ডলী থাকবে ডান হাতে ও যমীন সমূহ থাকবে বাম হাতে'।

ছহীহ বুখারীতে (হা/৭৪১২) 'ঈমান' অধ্যায়ে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে মারফূ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে যে, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক ক্বিয়ামতের দিন যমীনকে আপন মুষ্টিতে নিবেন। আকাশ মণ্ডলী থাকবে তাঁর ডান হাতে। অতঃপর তিনি বলবেন, আমিই মালিক'। এই হাদীছই উক্ত আয়াতের তাফসীরের জন্য বড় দলীল। আকাশ মণ্ডলীকে ঐ দিন আল্লাহ পাক ভাঁজ করা অবস্থায় নিজ ডান হাতে নিবেন এবং যমীনকেও তিনি মুষ্টিতে নেবেন ও হাতে দুলিয়ে বলবেন আমিই মালিক'। দলীল যেহেতু প্রমাণিত, সেহেতু এখানে তাবীলের কোন উপায় নেই।

[ই,ফা,বা, এখানে অনুবাদ করেছে 'আকাশ মণ্ডলী থাকিবে তাঁহার করায়ত্ত'। অথচ প্রকৃত অনুবাদ হবে 'তাঁর ডান হাতে ভাঁজ করা অবস্থায়'। অতঃপর টীকা দিয়েছে 'মুষ্টি' রূপক অর্থে অধিকার; 'ইয়ামীন' দক্ষিণ' রূপক অর্থে শক্তি, ক্ষমতা (পৃঃ ৭৬১, টীকা ১৭০)। এটি নিঃসন্দেহে ভ্রান্ত অনুবাদ ও ভ্রান্ত ব্যাখ্যা।]

২৪. আল্লাহ্র পায়ের নলা (صفة الساق) গুণঃ

ক্বলম-৪২ঃ (يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَ يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُوْدِ فَلاَ يَسْتَطِيْعُوْنَ) 'যেদিন হাঁটুর নীচের অংশ (পায়ের নলা) উন্মুক্ত করা হবে এবং তাদেরকে সিজদার জন্য আহ্বান করা হবে, কিন্তু তারা তাতে সক্ষম হবে না'।

মাননীয় তাফসীরকার অত্র আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, (يوم يكشف عن ساق: هوعبارة عن شدة الأمر يوم القيامة للحساب والجزاء) 'যেদিন হাঁটুর নীচের অংশ উন্মুক্ত করা হবে'ঃ এর দ্বারা ক্বিয়ামতের দিনের হিসাব ও বদলা দানের কঠিন অবস্থার কথা বুঝানো হয়েছে।'

[ই,ফা,বা, উক্ত আয়াতের অনুবাদ করেছে, 'স্মরণ কর সেই চরম সংকটের দিনের কথা সেই দিন উহাদিগকে আহ্বান করা হইবে সিজদা করিবার জন্য কিন্তু উহারা তাহা করিতে সক্ষম হইবে না' *(পৃঃ ৯৪৫)*। এখানে আল্লাহ্র 'পা' থাকার গুণকে অস্বীকার করা হয়েছে, যাতে তাঁকে 'নিরাকার' প্রমাণ করা যায়।]

আমরা বলি, উপরোক্ত তাফসীর উক্ত আয়াতের অন্যতম ব্যাখ্যা হ'তে পারে, যার দ্বারা ক্বিয়ামতের ভয়ংকর অবস্থার কথা বুঝানো যায়। তবে এই আয়াতের দ্বিতীয় তাফসীর হ'ল- 'আল্লাহ পাক ক্বিয়ামতের দিন তাঁর পায়ের নলা উন্মুক্ত করে দিবেন'। এই তাফসীরের প্রমাণ হ'ল আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত নিম্নোক্ত ছহীহ হাদীছ-

يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة ويبقى من كان يسجد فى الدنيا رياءً وسمعةً فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقًا واحدًا-

'আমাদের প্রভু স্বীয় পায়ের নলা উন্মুক্ত করে দিবেন। অতঃপর সকল মুমিন পুরুষ ও নারী সেখানে সিজদা করবে। বাকী থাকবে ঐসব লোক যারা দুনিয়াতে সিজদা করত লোক দেখানো ও নাম কেনার জন্য। তারা সিজদা করার জন্য যাবে। কিন্তু তাদের পৃষ্ঠদেশ একক তক্তার মত শক্ত হয়ে যাবে'।[৬]

এটা জানা কর্তব্য যে, যারা উক্ত আয়াতের প্রথমোক্ত তাফসীর করে থাকেন তাঁরা হাদীছে প্রমাণিত আল্লাহ্র (صفة الساق) বা 'পায়ের নলা' গুণকে অস্বীকার করেন না। কিন্তু তাঁরা একথাও বলেন না যে, অত্র আয়াতটি আল্লাহ্র উক্ত গুণ-এর উপরে প্রমাণশীল এবং অত্র আয়াতটিকে তাঁরা আল্লাহ্র গুণাবলী সংক্রান্ত আয়াতের মধ্যেও গণ্য করেন না। তারা এই গুণটিকে 'সুন্নাহ' দ্বারা প্রমাণ করেন। অতএব ঐ দুই ব্যাখ্যার মধ্যে কোন বিরোধ নেই। অর্থাৎ আল্লাহ ক্বিয়ামতের ভয়ংকর দিনে স্বীয় 'পায়ের নলা' উন্মুক্ত করে দিবেন।

এই ব্যাখ্যা নির্গুণবাদী মু'আত্ত্বিলাহদের বিরোধী। যারা আল্লাহ্র উক্ত (ساق) বা 'পায়ের নলা' গুণকে অস্বীকার করে। তারা এ ব্যাপারে কুরআন ও হাদীছের কোন বক্তব্যকে গ্রহণ করে না বরং এসবের অর্থ করে (شدة الأمر) বা 'কঠিন অবস্থা' বলে। কুরআনের আয়াতের ব্যাখ্যায় উক্ত অর্থ গ্রহণ করা গেলেও হাদীছে কোন দ্ব্যর্থতা নেই। সেখানে 'পায়ের নলা'-কে সরাসরি আল্লাহ্র দিকে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়েছে।

[চলবে]

৬. বুখারী 'তাফসীর' অধ্যায় 'হাঁটুর নিম্নদেশ উন্মুক্ত হওয়া' অনুচ্ছেদ, হা/৪৯১৯।

আহলেহাদীছ আন্দোলন আল্লাহ্র সর্বশেষ অহি ভিত্তিক সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের এক বৈপ্লবিক আন্দোলন।

ইসলামী আন্দোলনে বিজয়ের স্বরূপ

মূলঃ ডঃ নাছের বিন সুলাইমান আল-ওমর

*অনুবাদঃ মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক**

(২য় কিস্তি)

সাহায্য ও বিজয়ের স্বরূপ বিশ্লেষণঃ

মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ آمَنُوْا فِى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُوْمُ الْأَشْهَادُ-

'নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলগণকে ও বিশ্বাসীদেরকে পার্থিব জীবনে এবং যেদিন সাক্ষীরা দণ্ডায়মান হবে সেদিন সাহায্য করব' *(মুমিন ৫১)*। وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ 'মুমিনদেরকে সাহায্য করা আমাদের দায়িত্ব' *(রূম ৪৭)*। إِنْ تَنْصُرُوْا اللهَ يَنْصُرْكُمْ- 'যদি তোমরা আল্লাহ্কে সাহায্য কর, তবে আল্লাহ তা'আলাও তোমাদেরকে সাহায্য করবেন' *(মুহাম্মাদ ৭)*। وَلَيَنْصُرَنَّ اللهُ مَنْ يَّنْصُرُهُ 'অবশ্যই আল্লাহ ঐ ব্যক্তিকে সাহায্য করবেন, যে তাঁকে সাহায্য করবে' *(হজ্জ ৪০)*।

وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِيْنَ- إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُوْرُوْنَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُوْنَ-

'নিশ্চয়ই আমার কথা আমার রাসূলগণের ক্ষেত্রে পূর্বে সাব্যস্ত হয়েছে যে, তারা অবশ্যই সাহায্যপ্রাপ্ত হবেন এবং আমার বাহিনী অবশ্যই বিজয়ী হবে' *(ছাফফাত ১৭১-৭৩)*।

এই আয়াতগুলি ছাড়াও এরূপ আরও অনেক আয়াত রয়েছে, যা একজন প্রচারকের পক্ষে এলাহী সাহায্যের প্রমাণ বহন করে। চাই সে প্রচারক রাসূল হউন, কিংবা মুমিন হউন। আল্লাহ প্রদত্ত এ সাহায্য আসবে আখেরাতের আগে দুনিয়াবী জীবনেই।

কুরআন-হাদীছ থেকে যা জানা যায়, তাতে অনেক নবীকে তাঁদের শত্রুরা হত্যা করে লাশ পর্যন্ত বিকৃত করে দিয়েছে। ইয়াহইয়া ও শু'আইব (আঃ)-এর ক্ষেত্রে এরূপ ঘটেছিল। আবার অনেক নবীকে তাঁদের গোত্র হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল। তাঁরা তাদের ছোবল থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছিলেন বটে, কিন্তু তাঁদের দেশ ছাড়তে হয়েছে। যেমন ইবরাহীম (আঃ) স্বজাতি ও স্বদেশ ছেড়ে শাম দেশে হিজরত করেন। ঈসা (আঃ)-কে তাঁর জাতি যখন হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল, তখন তাঁকে আল্লাহ উর্ধ্বলোকে তুলে নিয়েছিলেন।

মুমিনদেরকেও অনুরূপ বর্বরতম শাস্তি দেওয়া হয়েছে। কাউকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হয়েছে, কাউকে শহীদ করা হয়েছে, কেউ দুঃখ-কষ্ট ও নির্যাতন-নিপীড়নের মধ্য দিয়ে কালাতিপাত করেছে। তবে এভাবে বাড়ি থেকে বিতাড়িত হওয়া, হত্যার শিকার ও শাস্তি ভোগের পরও পার্থিব জীবনে আল্লাহ্র সাহায্যের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হওয়ার কথা কিভাবে বিশ্বাস করা যায়? *(তাফসীরে ত্বাবারী ২৪/৭৪ পৃঃ; ফী যিলালিল কুরআন ৫/৩০৮৫ পৃঃ)*।

আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি কখনই বিলম্বিত হয় না। কিন্তু বিভিন্ন প্রকার সাহায্যের কথা বাদ দিয়ে আল্লাহ্র প্রকাশ্য সাহায্য ও দ্বীনের বিজয় লাভের মত একটি মাত্র সাহায্যের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করাতেই এরূপ প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে। তাছাড়া আল্লাহ তা'আলা নবী-রাসূল ও মুমিনদেরকে যে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তা যে কেবল এই শ্রেণীর সাহায্যই হ'তে হবে, এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই।

আল্লাহ তাদেরকে যে সাহায্য প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা অবশ্যই অতীতে বাস্তবায়িত হয়েছে, বর্তমানে হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও বাস্তবায়িত হবে ইনশাআল্লাহ। এতে কোন সন্দেহ নেই। আর তা আখেরাতের পূর্বে দুনিয়ার জীবনেই হবে।

এ বিষয়টি সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা রাখার জন্য বিভিন্ন আয়াতে বর্ণিত نَصْرٌ বা 'সাহায্য' শব্দের মর্মার্থ ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। আমাদের স্মৃতিতে এ কথা আগেই ধরে রাখা দরকার যে, সাহায্যের নানা দিক ও প্রকৃতি রয়েছে। তার যেকোন একটি বাস্তবায়িত হ'লে আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হয়েছে বলে গণ্য হবে। নানা প্রকৃতির এই সাহায্যের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি নিম্নে উপস্থাপন করা হ'লঃ

(১) প্রত্যক্ষ বিজয় ও শত্রুর পরাজয়ঃ

আল্লাহ তা'আলা কখনও প্রচারকবৃন্দকে তাঁর শত্রুদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিজয় দান করেন। শত্রু তখন তাঁদের পদানত হয়ে যায়। বহু নবী-রাসূল এভাবে শত্রুদের বিরুদ্ধে সরাসরি বিজয় অর্জন করেছেন। দাঊদ ও সুলায়মান (আঃ) এরূপ বিজয় অর্জন করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন,

وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوْتَ وَآتَاهُ اللهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ-

'দাঊদ জালূতকে হত্যা করেন এবং আল্লাহ তাকে রাষ্ট্র ক্ষমতা ও প্রজ্ঞা দান করেন' *(বাক্বারাহ ২৫১)*।

وَكُلاًّ آتَيْنَا حُكْمًا وَّعِلْمًا-

'উভয়কেই (দাঊদ ও সুলায়মানকে) আমি শাসন ক্ষমতা ও জ্ঞান দান করেছি' *(আম্বিয়া ৭৯)*।

* সহকারী শিক্ষক, ঝিনাইদহ সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়, ঝিনাইদহ।

قَالَ رَبِّ اغْفِرْلِىْ وَهَبْ لِىْ مُلْكًا لاَّيَنْبَغِىْ لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِىْ-

'তিনি বললেন, রব আমার, আমাকে আপনি মার্জনা করুন এবং আমাকে এমন রাষ্ট্র দান করুন, যা আমার পর আর কারও জন্য সম্ভব হবে না' *(ছোয়াদ ৩৫)*।

মূসা (আঃ)-কে আল্লাহ তা'আলা ফির'আউন ও তার বাহিনীর বিরুদ্ধে সাহায্য করেছিলেন এবং তাঁর জীবদ্দশায় দ্বীনকে বিজয়ী করেছিলেন। আল্লাহ বলেন,

وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوْا يَعْرِشُوْنَ-

'ফির'আউন ও তার সম্প্রদায়ের শিল্প এবং তাদের নির্মিত প্রাসাদরাজি আমি ধ্বংস করে দিয়েছি' *(আ'রাফ ১৩৭)*।

فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَ أَغْرَقْنَا اَلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ-

'অতঃপর আমি তোমাদেরকে মুক্তি দিয়েছিলাম এবং ফির'আউন সম্প্রদায়কে এমন করে ডুবিয়ে দিয়েছিলাম, যা তোমরা তাকিয়ে দেখছিলে' *(বাক্বারাহ ৫০)*।

আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কেও আল্লাহ তা'আলা খুব বড় আকারে সাহায্য করেছেন। বদর ও পরবর্তী যুদ্ধগুলিতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর শত্রুদেরকে পদানত করেছেন। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্র দ্বীন বিজয়ী হয়েছে এবং ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا-

'নিশ্চয়ই আমি আপনাকে দিয়েছি সুস্পষ্ট বিজয়' *(ফাতহ ১)*।

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِىْ دِيْنِ اللهِ أَفْوَاجًا-

'যখন আল্লাহ্র সাহায্য ও বিজয় আসবে, আর আপনি লোকদের দেখতে পাবেন, তারা দলে দলে আল্লাহ্র দ্বীনে প্রবেশ করছে' *(নাছর ১-২)*।

এ জাতীয় সাহায্য তো খুবই স্পষ্ট। 'সাহায্য' শব্দ উচ্চারণ করা মাত্রই এ দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়। কারণ (ক) প্রকাশ্য সাহায্য মানুষ চোখে দেখতে পায় এবং হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে পারে।

(খ) এ ধরনের সাহায্য একাধারে দ্বীন ও তার প্রচারক উভয়েরই বিজয়ের স্বাক্ষর বহন করে।

(গ) মানব মনের কাঙ্খিত ও প্রিয় বিষয়ই হ'ল এরূপ সাহায্য। এ সাহায্য দ্রুত ফলদায়ক। আর যা দ্রুত ফলদায়ক তার প্রতি মনের আকর্ষণ আপনা আপনি তৈরী হয়। এজন্যই মহান আল্লাহ বলেছেন,

وَأُخْرَى تُحِبُّوْنَهَا نَصْرٌمِّنَ اللهِ وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ-

'তিনি দান করবেন তোমাদের বাঞ্ছিত আরও একটি অনুগ্রহ; আল্লাহ্র সাহায্য ও আসন্ন বিজয়' *(ছফফ ১৩)*।

(২) মিথ্যারোপকারীদের ধ্বংসের মাধ্যমে সাহায্যঃ

কখনও মিথ্যারোপকারী কাফিরদের ধ্বংস সাধন এবং নবী-রাসূল ও তাঁদের সঙ্গী মুমিনদের নাজাত প্রদানের মাধ্যমে সাহায্য করা হয়। নূহ (আঃ)-কে আল্লাহ তা'আলা এভাবে সাহায্য করেছিলেন। তিনি মুক্তি পেয়েছিলেন কিন্তু তাঁর কাফির জাতিকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছিল। যেমন পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে,

فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّى مَغْلُوْبٌ فَانْتَصِرْ، فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُّنْهَمِرٍ، وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُوْنًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَّدُسُرٍ- تَجْرِىْ بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِّمَنْ كَانَ كُفِرَ-

'তিনি (নূহ) তাঁর রবকে আহ্বান করে বললেন, আমি তো অসহায়, অতএব আপনি প্রতিবিধান করুন। ফলে আমি উন্মুক্ত করে দিলাম আকাশের দ্বার প্রবল বারি বর্ষণে এবং মৃত্তিকা হ'তে উৎসারিত করলাম প্রস্রবণ। অতঃপর সকল পানি মিলিত হ'ল এক পরিকল্পনা অনুসারে। তখন নূহকে আরোহন করালাম কাষ্ঠ ও কীলক নির্মিত এক নৌযানে। যা চলত আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে। এটা তার জন্য প্রতিদান যাকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল' *(ক্বামার ১০-১৪)*।

একই পরিণতি ঘটেছিল হূদ (আঃ)-এর ক্বওমের। আল্লাহ বলেন,

فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوْا مُؤْمِنِيْنَ-

'অনন্তর আমি তাঁকে ও তাঁর সাথে যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে মুক্তি দিয়েছিলাম এবং যারা আমার বিধানাবলীকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিল তাদের মূলচ্ছেদ করেছিলাম। বস্তুতঃ তারা মুমিন ছিল না' *(আ'রাফ ৭২)*।

ছালেহ (আঃ)-এর জাতির পরিণতি প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন,

فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوْا فِى دَارِهِمْ جَاثِمِيْنَ-

'তাদেরকে ভূমিকম্প আঘাত হেনেছিল, ফলে তারা তাদের লোকালয়ে অধঃমুখী হয়ে পড়েছিল' *(আ'রাফ ৭৮)*।

লূত (আঃ)-এর জাতির পরিণাম সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِيْنَ-

'আমি তাদের উপর প্রবল বারিপাত করেছিলাম। সুতরাং পাপীষ্ঠদের পরিণতি কিরূপ দাঁড়িয়েছিল তা আপনি লক্ষ্য করুন' *(আ'রাফ ৮৪)*।

শু'আইব (আঃ)-এর জাতি প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন,

فَكَذَّبُوْهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ-

'অতঃপর ওরা তাঁকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করল। ফলে ওদের মেঘাচ্ছন্ন দিবসে শাস্তি গ্রাস করল। এত ছিল এক ভীষণ দিবসের শাস্তি' *(শু'আরা ১৮৯)*।

পাপীষ্ঠদের এভাবে কঠিন শাস্তিতে জর্জরিত করা নিশ্চয়ই প্রচারকদের প্রতি বিরাট সাহায্য এবং মিথ্যারোপকারী, দুর্মুখ নাস্তিক ও সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের প্রতি লাঞ্ছনা ও নির্মম কষাঘাত।

আল্লাহ অবশ্য পাপীদের অবকাশ দেন, তাই বলে চিরতরের জন্য অবকাশ দেন না। তিনি বলেন,

فَكُلاًّ أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَّ مِنْهُمْ مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَّنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوْا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ-

'ওদের প্রত্যেককেই আমি তার অপরাধের জন্য শাস্তি দিয়েছিলাম। ওদের কারও প্রতি প্রেরণ করেছিলাম প্রস্তরসহ প্রচণ্ড ঝটিকা, কাউকে আঘাত করেছিল মহানাদ, কাউকে আমি প্রোথিত করেছিলাম ভূগর্ভে এবং কাউকে করেছিলাম নিমজ্জিত। আল্লাহ তাদের প্রতি কোন যুলুম করেননি; বরং তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি যুলুম করেছিল' *(আনকাবূত ৪০)*।

(৩) নবী-রাসূলগণের তিরোধানের পর শত্রুদের বিরুদ্ধে আল্লাহর প্রতিশোধ গ্রহণের মাধ্যমে সাহায্যঃ

যারা নবী-রাসূল ও দ্বীন প্রচারকদের প্রচারিত সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে, অনেক সময় নবী-রাসূলগণের ইনতিকালের পর আল্লাহ তাদের থেকে প্রতিশোধ নিয়ে থাকেন। ইয়াহইয়া (আঃ), শুয়াইব (আঃ)-এর হত্যাকারীদের ক্ষেত্রে এবং ঈসা (আঃ)-এর হত্যার প্রচেষ্টাকারীদের বিরুদ্ধে এরূপ প্রতিশোধ নেয়া হয়েছিল। আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলগণ ও ঈমানদারগণকে পৃথিবীর জীবনেই সাহায্য করব' *(মুমিন ৫১)*। এ আয়াতের অর্থ প্রসঙ্গে ইমাম তাবারী (রহঃ) বলেছেন, 'আমি এই সাহায্য হয় যারা আমাকে মিথ্যুক গণ্য করতে চায়, তাদের বিরুদ্ধে রাসূলগণকে বিজয়ী করে করব, নয়তো রাসূলগণকে যারা প্রত্যাখ্যান করেছে, রাসূলদের ধ্বংস ও ওফাতের পর ঐ প্রত্যাখ্যানকারীদের থেকে এই পার্থিব জীবনে প্রতিশোধ গ্রহণের মাধ্যমে করব। যেমন নবী শু'আইব (আঃ)-কে হত্যা করার পর আমি তাঁকে সাহায্য করেছিলাম। তাঁর হত্যাকারীদের উপর আমি ক্ষমতাশালী কিছু লোক নিযুক্ত করেছিলাম এবং তাদের হাতে হত্যাকারীদের নাস্তানাবুদ করে দিয়েছিলাম। ঈসা (আঃ)-এর হত্যা প্রচেষ্টাকারীদের থেকে রোমকদের মাধ্যমে প্রতিশোধ নিয়েছিলাম। তারা ওদের ধ্বংস করে দিয়েছিল। ইয়াহইয়া (আঃ)-কে যারা হত্যা করেছিল তাদের উপর আমি ব্যাবিলনের বাদশাহ বখতে নছর (নেবুচাদ নেজার)-কে চাপিয়ে দিয়েছিলাম। এভাবে ইয়াহইয়া (আঃ)-এর হত্যাকারীদের থেকে তার মাধ্যমে আমি প্রতিশোধ নিয়েছিলাম *(তাফসীরে ত্বাবারী ২৪/৭৪ পৃঃ)*। আল্লাহর বাণী, وَلَوْ يَشَاءُ اللهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ-

'আল্লাহ ইচ্ছে করলে তাদের থেকে প্রতিশোধ নিতে পারতেন' *(মুহাম্মাদ ৪)*। এসবই আল্লাহর উক্তির মর্ম।

(৪) জেল, হত্যা, বাস্তুভিটা হ'তে উৎখাত, যুলুম-নির্যাতন ইত্যাদি যা বাহ্যদৃষ্টিতে পরাজয়, কিন্তু ক্ষেত্র বিশেষে তা-ই বিজয়ঃ

মানুষের বাহ্যদৃষ্টিতে উপরোক্ত বিষয়গুলি পরাজয় গণ্য হ'লেও অনেক সময় তা প্রকৃতপক্ষে জয়রূপেই প্রতিপন্ন হয়। একজন প্রচারকের নিহত হওয়া কি আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হওয়া নয়? আল্লাহ বলেন,

وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوا فِى سَبِيْلِ اللهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ-

'যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয় তাদেরকে তুমি কখনও মৃত মনে করো না; বরং তারা জীবিত। তাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে তারা রিযিক প্রাপ্ত হয়' *(আলে ইমরান ১৬৯)*।

قِيْلَ ادْخُلِى الْجَنَّةَ قَالَ يَالَيْتَ قَوْمِىْ يَعْلَمُوْنَ، بِمَا غَفَرَلِىْ رَبِّىْ وَجَعَلَنِى مِنَ الْمُكْرَمِيْنَ.

'বলা হ'ল, 'যাও, জান্নাতে যাও'। সে তখন বলল, 'হায় আফসোস! আমার জাতি যদি জানত যে, কেন আমার প্রতিপালক আমাকে ক্ষমা করলেন এবং আমাকে সম্মানিতজনদের অন্তর্ভুক্ত করলেন' *(ইয়াসীন ২৬-২৭)*।

قُلْ هَلْ تَرَبَّصُوْنَ بِنَا إِلاَّ إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ-

'আপনি বলুন, তোমরা তো আমাদের জন্য দু'টি কল্যাণকর দিকের যেকোন একটির অপেক্ষা বৈ অন্য কিছু করছ না' *(তওবা ৫২)*।

অতএব ইসলাম প্রচার করতে গিয়ে প্রচারক নিহত হ'লেও নানাদিক দিয়েই তা বিজয় বলে গণ্য হবে। যেমন-

(ক) শাহাদাতের অমিয় সুধা পানঃ

শাহাদাত মানব জীবনের জন্য চরম ও পরম বিজয়। আল্লাহ তা'আলা এজন্যই এরশাদ করেছেন, 'যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয় তাদেরকে তুমি কখনও মৃত মনে করো না; বরং তারা জীবিত। তাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে তারা রিযিক প্রাপ্ত হয়। আল্লাহ স্বীয় অনুগ্রহে তাদের যা দেন তাতে তারা আনন্দিত' *(আলে ইমরান ১৬৯-১৭০)*।

[চলবে]

ইলমে নাহুঃ উৎপত্তি

নূরুল ইসলাম*

(২য় কিস্তি)

বিকাশঃ

আবুল আসওয়াদ আদ-দুওয়ালীর হাতে 'ইলমে নাহু'র গোড়াপত্তনের পর আব্বাসীয় যুগে বছরী ও কূফী নাহবীগণের হাতে এ শাস্ত্র পরিপূর্ণতা লাভ করে এবং একটি পৃথক শাস্ত্রের মর্যাদা লাভ করে। এক্ষেত্রে বছরার বৈয়াকরণগণ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।[১৯] বছরী বৈয়াকরণগণের মধ্যে ইবনু ইসহাক্ব প্রথম স্বরচিহ্নের (إِعْرَاب) কারণ উল্লেখ করেন,[২০] ঈসা ইবনু ওমর আছ-ছাক্বাফী প্রথম নাহু'র গ্রন্থ প্রণয়ন করেন[২১], হারূণ ইবনু মূসা প্রথম ইহা সংরক্ষণ করেন এবং সীবাওয়াইহ্ নাহু'র গ্রন্থ রচনায় প্রথম দক্ষতার পরিচয় দেন।[২২]

বছরায় 'ইলমে নাহু' চর্চা প্রসার লাভ করলে কূফীগণ বছরী নাহবীগণের কাছ থেকে নাহু শিক্ষা লাভ করেন। কালক্রমে বছরী ও কূফী নাহবীগণ নাহুর খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে তুমুল বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন। ফলে নাহু শাস্ত্রে কূফী ও বছরী মতবাদ নামে দু'টি স্বতন্ত্র মতবাদের সৃষ্টি হয়। প্রত্যেকেই স্বীয় মতবাদের পক্ষে বলিষ্ঠ যুক্তি পেশ করতেন।[২৩]

উভয় মতবাদের মধ্যে দ্বন্দ্বের প্রধান কারণ ছিল এই যে, বছরীগণ শ্রবণকে প্রাধান্য দিতেন। তারা একান্ত বাধ্যগত অবস্থা ছাড়া কিয়াসের তোয়াক্কা করতেন না এবং বর্ণনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত কড়াকড়ি আরোপ করতেন। ফলে তারা বিশুদ্ধভাষী খাঁটি আরবীয় বেদুঈন ছাড়া অন্যের কাছ থেকে বর্ণনা গ্রহণ করতেন না। কিন্তু কূফী বৈয়াকরণগণ অধিকাংশ নাহবী বিধি-বিধানে কিয়াসের উপর নির্ভর করতেন। ফলে বছরী নাহবীগণের কাছে যে বেদুঈন বিশ্বস্ত সাব্যস্ত হ'ত না, তার কাছ থেকেও কূফীগণ বর্ণনা গ্রহণ করতে দ্বিধা করতেন না।[২৪]

বছরী নাহবীগণ ছিলেন জ্ঞানে ও বিচার-বিশ্লেষণে অত্যন্ত দক্ষ এবং বর্ণনায় অত্যধিক নির্ভরযোগ্য। কিন্তু কূফা বাগদাদের নিকটবর্তী হওয়ায় এবং কূফী নাহবীগণ আব্বাসীয় খলীফাগণের সমর্থক হওয়ায় আব্বাসীয় খলীফাগণ কূফীগণকে বছরীগণের উপর প্রাধান্য দিতেন। তাঁরা কূফী নাহবীগণকে তাদের সন্তান-সন্ততির শিক্ষক নিয়োগ করতেন। ফলে আব্বাসীয় খলীফাগণের রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতায় কূফী মতবাদ রাজধানী বাগদাদে বিস্তার লাভ করে।[২৫]

'ইলমে নাহু'র বিকাশে প্রখ্যাত বছরী নাহবীগণের অবদান

আছ-ছাক্বাফী (মৃত ১৪৯ হিঃ /৭৬৬ খৃঃ)ঃ

আবূ আমর ঈসা ইবনু ওমর আছ-ছাক্বাফী ভাষাতত্ত্ব, নাহু ও ইলমে কিরাআতের এক অনন্য পণ্ডিত ছিলেন।[২৬] 'ইলমে নাহু'র বিকাশে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তিনি নাহু শাস্ত্রে সত্তরের অধিক গ্রন্থ প্রণয়ন করেছিলেন। কিন্তু اَلْجَامِعُ ও اَلْإِكْمَالُ ছাড়া সবগুলি ভস্মীভূত হয়ে যায়।[২৭] এ গ্রন্থ দু'টির প্রশংসায় বৈয়াকরণ খলীল ইবনু আহমাদ আল-ফারাহীদী বলেন-

بَطَلَ النَّحْوُ جَمِيعًا كُلُّهُ × غَيْرَمَا أَحْدَثَ عِيْسَى بْنُ عُمَرْ
ذَاكَ (إِكْمَالٌ) وَهَذَا جَامِعٌ × فَهُمَا لِلنَّاسِ شَمْسٌ وَقَمَرْ

অর্থাৎ 'ঈসা ইবনু ওমর প্রণীত গ্রন্থ ব্যতীত নাহুর সব গ্রন্থ বাতিল হয়ে গেছে। 'ইকমাল' ও 'জামে' গ্রন্থ দু'টি মানুষদের জন্য চন্দ্র ও সূর্য সদৃশ'।[২৮]

তবে উল্লেখিত গ্রন্থ দু'টিও কালের গর্ভে হারিয়ে গেছে এবং পরবর্তীতে এগুলি কারো দৃষ্টিগোচর হয়নি।[২৯] কেউ কেউ মনে করেন যে, সীবাওয়াইহ্ 'জামে' গ্রন্থটির ভাষ্য রচনা করে নিজের নামে চালিয়ে দেন।[৩০] সঠিক তথ্য আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

খলীল ইবনু আহমাদ আল-ফারাহীদী (মৃত ১৭৪হিঃ/৭৮৯খৃঃ)ঃ

খলীল ইবনু আহমাদ ভাষাতত্ত্ব, ছন্দ বিজ্ঞান ও 'ইলমে নাহু'র এক অনন্য পণ্ডিত ছিলেন।[৩১] আল-ওয়াহিদী স্বীয় তাফসীরে বলেন,

اَلْإِجْمَاعُ مُنْعَقِدٌ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَعْلَمَ بِالنَّحْوِ مِنَ الْخَلِيْلِ-

অর্থাৎ 'খলীলের চেয়ে 'ইলমে নাহু' কেউ বেশী জানত না-

---

* আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

১৯. জুরজী যায়দান, প্রাগুক্ত, ২/১৩০ পৃঃ।
২০. আহমাদ হাসান আয-যাইয়াত, তারীখুল আদাবিল আরাবী (বেরুতঃ দারুল মা'রেফাহ, ৪র্থ প্রকাশঃ ১৪১৮হিঃ/১৯৯৭ খৃঃ), পৃঃ ২৬৭।
২১. বুতরুসুল বুসতানী, উদাবাউল আরব ফিল আ'ছরিল আব্বাসিইয়াহ (বেরুতঃ দারু নাযীর আব্বূদ, তাবি), পৃঃ ১৬০।
২২. জুরজী যায়দান, প্রাগুক্ত, ২/১৩০।
২৩. উদাবাউল আরব, পৃঃ ১৬২; যাইয়াত, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৬৭; জুরজী যায়দান, প্রাগুক্ত, ২/১৩০ পৃঃ।
২৪. যাইয়াত, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৬৭।
২৫. ঐ; উদাবাউল আরব, পৃঃ ১৬২-১৬৩; জুরজী যায়দান, প্রাগুক্ত, ২/১৩০পৃঃ।
২৬. আল-বেদায়াহ ওয়ান নেহায়াহ ১০/১০৮ পৃঃ।
২৭. শাযারাতুয যাহাব ১/২২৫ পৃঃ।
২৮. আল-ফিহরিস্ত, পৃঃ ৪২।
২৯. মিফতাহুস সা'আদাহ ১/১৪৫ পৃঃ; আল-ফিহরিস্ত, পৃঃ ৪২।
৩০. ওফায়াতুল আ'য়ান ৩/৪৮৬ পৃঃ।
৩১. ডঃ ওমর ফররূখ, তারীখুল আদাবিল আরাবী (বেরুতঃ দারুল ইলম লিল-মালায়ীন, ৬ষ্ঠ সংস্করণঃ ১৯৯৭), ২য় খণ্ড, পৃঃ ১১২; শাযারাতুয যাহাব ১/২৭৫ পৃঃ; ইমবাহুর রুওয়াত ১/৩৪২ পৃঃ।

এ বিষয়ে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে'।[৩২] তাঁর প্রচেষ্টায় 'ইলমে নাহু' এক সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় এবং অনেক নাহবী পরিভাষা ও বিধি-বিধান প্রকাশিত হয়।[৩৩] নাহবী-বিধান উদ্ভাবন, স্বরচিহ্নের কারণ উল্লেখ এবং বিশুদ্ধ নিয়ম-নীতি প্রণয়নে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত।[৩৪] যুবায়দী বলেন,

فَهُوَ الَّذِيْ بَسَطَ النَّحْوَ وَمَدَّ أَطْنَابَهُ وَسَبَّبَ عِلَلَهُ وَفَتَقَ مَعَانِيْهِ، وَأَوْضَحَ الْحُجَجَ فِيْهِ حَتَّى بَلَغَ أَقْصَى حُدُوْدِهِ-

অর্থাৎ 'তিনিই নাহুর পরিধিকে বিস্তৃত করেন, উহার স্বরচিহ্নের কারণ উল্লেখ করেন, উহার অর্থসমূহ আবিষ্কার করেন এবং এ বিষয়ে দলীল-প্রমাণাদি এমনভাবে ব্যাখ্যা করেন যে, 'ইলমে নাহু' তার সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছে যায়'।[৩৫] এজন্য তাঁকে 'ইলমে নাহুর প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা' (اَلْمُؤَسِّسُ الْحَقِيْقِيْ لِعِلْمِ النَّحْوِ الْعَرَبِيْ) বলা হয়ে থাকে।[৩৬]

আরবী ভাষা ও নাহু সংক্রান্ত তাঁর 'কিতাবুল আয়ন' (كِتَابُ الْعَيْنِ) অভিধানটি অত্যন্ত বিখ্যাত। এ অভিধানে তিনি শব্দ সংকলনের সাথে সাথে আরবী ব্যাকরণের নিয়ম-নীতিও সংকলন করেছেন।[৩৭]

সীবাওয়াইহ্ (মৃত ১৮০ হিঃ/৭৯৬খৃঃ)ঃ

আবূ বিশর আমর ইবনু ওছমান ইবনু কানবার আরবী ভাষা ও সাহিত্য জগতে 'সীবাওয়াইহ্' রূপেই সর্বাধিক খ্যাত।[৩৮] বৈয়াকরণ খলীল ইবনু আহমাদ, ঈসা ইবনু ওমর, ইউনুস ইবনু হাবীব প্রমুখের নিকট থেকে তিনি 'নাহু'র শিক্ষা অর্জন করেন।[৩৯] 'নাহু' শাস্ত্রে তিনি অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। তিনি 'বছরী মতবাদের ইমাম বা নেতা' (إِمَامُ الْبَصْرِيِّيْنَ) 'নাহবীগণের শিক্ষক (أُسْتَاذُ النُّحَاةِ/شَيْخُ النُّحَاةِ) (اَلنُّحَاةِ, 'নাহবীগণের নেতা'(إِمَامُ النُّحَاةِ) রূপে বরিত হন।[৪০]

সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ প্রণয়নে পানীনী এবং আধুনিক ব্যাকরণ প্রণয়নে De Saussure-এর যে স্থান, আরবী ব্যাকরণ প্রণয়নে সীবাওয়াইহ্ এর সে স্থান।[৪১] আরবী ব্যাকরণে তাঁর অন্যতম কীর্তি হচ্ছে 'আল-কিতাব' (اَلْكِتَابُ) নামক গ্রন্থটি। এ গ্রন্থে তিনি স্বীয় উস্তাদ খলীল ইবনু আহমাদ, ইউনুস ইবনু হাবীব, আমর ইবনু 'আলা প্রমুখের মতামত একত্রিত করেছেন।[৪২] তবে এ গ্রন্থের অধিকাংশ নিয়ম-নীতি খলীল ইবনু আহমাদের আবিষ্কার বলে গবেষকগণ মত ব্যক্ত করেছেন। ডঃ শাওকী যাইয়িফ বলেন, এ গ্রন্থের প্রায় ৩৭০ স্থানে তিনি খলীলের মতামত উল্লেখ করেছেন।[৪৩]

আস-সীরাফী বলেন, كُلُّ مَا قَالَ سِيْبَوَيْهِ: سَأَلْتُهُ أَوْقَالَ مِنْ غَيْرِأَنْ يَّذْكُرَ قَائِلَهُ فَهُوَ الْخَلِيْلُ অর্থাৎ 'যে সব স্থানে সিবাওয়াইহ্ বলেছেন যে, 'আমি তাকে জিজ্ঞাসা করেছি' অথবা যেখানে প্রবক্তার কথা উল্লেখ না করেই বক্তব্য পেশ করেছেন, সেখানে খলীল উদ্দেশ্য'।[৪৪] এ গ্রন্থে তিনি শুধু উস্তাদগণের কথাই নকল করেননি; বরং নিজেও বেদুঈনদের মুখ থেকে শুনে অনেক নিয়ম-নীতি আবিষ্কার করেছেন। যেমন তিনি বলেছেন-

سَمِعْتُ عَرَبِيًّا مَّوْثُوْقًا بِعَرَبِيَّتِهِ يَقُوْلُ، سَمِعْتُ أَعْرَابِيًّا، لَمْ نَسْمَعْ عَرَبِيًّا يَقُوْلُ، سَمِعْتُ رَجُلاً مِّنَ الْعَرَبِ يُنْشِدُ هَذَا الْبَيْتَ

ইত্যাদি।[৪৫] এ গ্রন্থে ১০৫০টি কবিতার চরণ রয়েছে।[৪৬]

"اَلْكِتَابُ" গ্রন্থটি ৮২০টি পরিচ্ছেদ সম্বলিত দু'টি বৃহৎ খণ্ডে বিভক্ত।[৪৭] গ্রন্থটি একাধিকবার মুদ্রিত হয়েছে। অনূদিত হয়েছে জার্মান ভাষায়।[৪৮] এ গ্রন্থের ১ম খণ্ডে বাক্য ও এর শ্রেণী-বিভাগ, কর্তা, কর্ম, ক্রিয়া, কারক, ক্রিয়ামূলের বিধান, হাল, অধিকরণ, হরফে জার, বদল, নির্দিষ্ট ও অনির্দিষ্ট, বিশেষণ, উদ্দেশ্য, বিধেয়, ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য, ক্রিয়াবাচক অব্যয়, সম্বোধন, তারখীম, لا অব্যয় দ্বারা না বাচক বাক্য এবং ইস্তেছনা আলোচিত হয়েছে। আর ২য় খণ্ডে আলোচিত হয়েছে মুনছারিফ, গায়র মুনছারিফ, সম্বন্ধ, ইযাফাত, দ্বি-বচন, তাছগীর, মাকছূর, মামদূদ, বহুবচন, أَفْعَلْتُ، فَعَلْتُ ও তৎসম্পর্কিত অতিরিক্ত ক্রিয়াবাচক শব্দ, ওয়াকফ ও তার শর্তসমূহ ইত্যাদি।[৪৯]

আলোচ্য গ্রন্থটি তদানীন্তন সময়ে এক অভূতপূর্ব প্রভাব বিস্তার করেছিল। সে সময় যদি বছরায় বলা হ'ত قَرَأَ

---

৩২. *শাযারাতুয যাহাব ১/২৭৭ পৃঃ।*
৩৩. *আল-মুহত্বালাহ আন-নাহবী, পৃঃ ১৯২।*
৩৪. *আল-খেলাফ বায়নান নাইবিইয়ীন, পৃঃ ৪২; আল-ফিহরিস্ত, পৃঃ ৪২; উদাবাউল আরব, পৃঃ ১৬৪।*
৩৫. *যুহাল ইসলাম ২/২৯০ পৃঃ।*
৩৬. *কার্ল ব্রকলম্যান, তারীখুল আদাবিল আরাবী, ডঃ আব্দুল হালীম আন-নাজ্জার অনূদিত (কায়রোঃ দারুল মা'আরিফ, ৫ম প্রকাশ, তাবি), ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৩১।*
৩৭. *উদাবাউল আরব, পৃঃ ১৬৫।*
৩৮. *ইবনুল জাওযী, আল-মুন্তাযাম ফী তারীখিল মুলূক ওয়াল উমাম (বৈরুতঃ দারুল কুতুব আল-ইলমিইয়াহ, তাবি), ৯ম খণ্ড, পৃঃ ৫৩।*
৩৯. *ডঃ ওমর ফররূখ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১২০; ওফায়াতুল আ'য়ান ৩/৪৬৩ পৃঃ; আল-ফিহরিস্ত, পৃঃ ৫; ইমবাহুর রুওয়াত ২/৩৪৬ পৃঃ।*
৪০. *আল-বেদায়াহ ওয়ান নেহায়াহ ১০/১৮২, ১১/৭৪; যাইয়াত, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৬৮।*
৪১. *আল-মুহত্বালাহ আন-নাহবী, পৃঃ ৮০।*
৪২. *যুহাল ইসলাম ২/২৯১ পৃঃ; ব্রকলম্যান, প্রাগুক্ত ২/১৩৪ পৃঃ।*
৪৩. *ডঃ শাওকী যাইয়িফ, তারীখুল আদাবিল আরাবী, আল-আছরুল আব্বাসী আল-আউয়াল (কায়রোঃ দারুল মা'আরিফ, তাবি), পৃঃ ১২২।*
৪৪. *আল-আছরুল আব্বাসী আল-আউয়াল, পৃঃ ১২২।*
৪৫. *আল-মুহত্বালাহ আন-নাহবী, পৃঃ ৮৩।*
৪৬. *যুহাল ইসলাম ২/২৯১ পৃঃ।*
৪৭. *উদাবাউল আরব, পৃঃ ১৬০; হান্না আল-ফাখূরী, তারীখুল আদাবিল আরাবী (আল-মাতবা'আতুল বুলিসিয়াহ, তাবি), পৃঃ ৭৬৫।*
৪৮. *উদাবাউল আরব, পৃঃ ১৬০; জুরজী যায়দান, প্রাগুক্ত, ২/১৩২ পৃঃ।*
৪৯. *জুরজী যায়দান, প্রাগুক্ত, ২/১৩৩ পৃঃ।*

فُلَانٌ الْكِتَابَ 'অমুক আল-কিতাব পাঠ করেছে'। তখন নিশ্চিতভাবে তারা বুঝে নিত যে, এটা সিবাওয়াইহ্-এর 'আল-কিতাব'।[৫০] এভাবে গ্রন্থটির নামই হয়ে যায় 'আল-কিতাব'।[৫১] শুধু সে যুগে নয় বর্তমান যুগেও তা আরবী ব্যাকরণের এক অনন্য ভাণ্ডার বলে বিবেচিত হয়।

গ্রন্থটি সম্পর্কে কে কি বলেনঃ

১. ভাষাবিদ পণ্ডিত আল-মুবাররিদ বলেন, لَمْ يُعْمَلْ كِتَابٌ فِيْ عِلْمٍ مِّنَ الْعُلُوْمِ مِثْلَهُ অর্থাৎ 'উক্ত গ্রন্থের ন্যায় কোন বিদ্যার গ্রন্থই প্রণীত হয়নি'।[৫২]

২. হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, اَلنَّاسُ عِيَالٌ عَلَى كِتَابِهِ الْمَشْهُوْرِ فِيْ هَذَا الْفَنِّ অর্থাৎ 'আরবী ব্যাকরণের প্রত্যেক সমস্যায় তার গ্রন্থের দ্বারা মানুষেরা সাহায্য গ্রহণ করে ও উপকৃত হয়'।[৫৩]

৩. ডঃ শাওকী যাইয়িফ বলেন, وَالْكِتَابُ يُعَدُّ آيَةً خَارِقَةً مِّنْ آيَاتِ الْعَقْلِ الْعَرَبِيِّ حَتَّى سَمَّاهُ بَعْضُهُمْ قُرْآنَ النَّحْوِ- অর্থাৎ 'আল-কিতাব'-কে আরবীয় জ্ঞান-ভাণ্ডারের অলৌকিক নির্দশনরূপে গণ্য করা হয়। এমনকি কেউ কেউ উহাকে 'নাহুর কুরআন' বা সংবিধান রূপে আখ্যায়িত করেছেন।[৫৪]

৪. ডঃ আহমাদ আমীন বলেন,

وَالْحَقُّ أَنَّ كِتَابَ سِيْبَوَيْهِ فِي النَّحْوِ وَالصَّرْفِ كَانَ مِنَ الْقُوَّةِ بِحَيْثُ كَانَ الْمَرْجِعُ فِي الْعَالَمِ الْاِسْلَامِيِّ مِنْ تَارِيْخِ تَأْلِيْفِهِ إِلَى الْيَوْمِ- وَكُلُّ مَافَعَلَهُ النَّاسُ إِنَّهُمْ شَرَحُوْا غَامِضًا أَوِ اخْتَصَرُوْا مُطَوَّلاً، أَوْ بَسَطُوْا مُعْضَلاً- أَمَّا الْأُسُسُ الَّتِيْ بُنِيَ عَلَيْهَا الْكِتَابُ فَبَقِيَتْ كَمَا هِيَ فِي النَّحْوِ وَالصَّرْفِ إِلَى الْيَوْمِ، مِنْ عَهْدِ شَرْحِ الصِّيْرَافِيِّ لِكِتَابِ سِيْبَوَيْهِ، إِلَى النَّحْوِ الْوَاضِحِ لِلْمَرْحُوْمِ الْجَارِمِ بِكْ-

অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে নাহু ও ছরফ সম্পর্কিত সীবাওয়াইহ্-এর কিতাব অত্যন্ত শক্তিশালী কিতাব, যা রচনার দিন থেকে অদ্যাবধি ইসলামী জগতে এক অনন্য সূত্র গ্রন্থ রূপে বিবেচিত হয়ে আসছে। পরবর্তীতে মানুষেরা উহার অস্পষ্ট অংশ স্পষ্ট করেছেন অথবা সংক্ষিপ্ত করেছেন অথবা দুর্বোধ্য অংশ ব্যাখ্যা করেছেন। আর যে ভিত্তির উপর গ্রন্থটি রচনা করা হয়েছিল তা ছীরাফী কর্তৃক সীবাওয়াইহ-এর কিতাবের ভাষ্য রচনা থেকে জারিম বেক-এর 'আন-নাহবুল ওয়াযেহ' প্রণয়ন পর্যন্ত অবশিষ্ট রয়েছে।[৫৫]

৫. ইওয়ায হামদ আল-কূযী বলেন, وَالْكِتَابُ يُعْتَبَرُ أَوَّلُ مَوْسُوْعَةٍ عَرَبِيَّةٍ تَجْمَعُ الْمَعَارِفَ اللُّغَوِيَّةَ فِيْ شَتَّى نَوَاحِيْهَا- অর্থাৎ 'আল-কিতাব'কে প্রথম আরবী বিশ্বকোষ রূপে গণ্য করা হয়। যা ভাষাতাত্ত্বিক জ্ঞানের বিভিন্ন দিককে একত্রিত করেছে।[৫৬]

৬. S.M. Yusuf বলেন, "His kitab has throughout the ages been regarded as the final work on Arabic grammar and has become proverbial for its unique position in the field".[৫৭]

আল-হাররা (মৃত ১৮৭ হিঃ)ঃ

আবূ মুসলিম মা'আয ইবনু মুসলিম আল-হাররা বিশিষ্ট নাহবী ছিলেন।[৫৮] তাঁর জ্ঞানের পরিধি সম্পর্কে জনৈক কবি বলেন,

إِنَّ مَعَاذَ بْنَ مُسْلِمٍ رَجُلٌ × لَيْسَ لِمِيْقَاتِ عِلْمِهِ أَمَدُ

অর্থাৎ 'মা'আয ইবনু মুসলিম এমন ব্যক্তি যার জ্ঞানের পরিধি ব্যাপক'।[৫৯] তাঁর শিষ্যদের মধ্যে আল-কিসাঈ-এর নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।[৬০] তিনি নাহু শাস্ত্রে অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করলেও সেগুলি সম্পর্কে কোন তথ্য জানা যায় না।[৬১] তাঁকে عِلْمُ الصَّرْفِ বা 'শব্দ প্রকরণ বিদ্যা'র প্রবর্তনকারী বলে গণ্য করা হয়।[৬২]

---

৫০. *উদাবাউল আরব, পৃঃ ১৬০-১৬১।*
৫১. *আল-খেলাফু বায়নান নাইবিইয়ীন, পৃঃ ৪৪।*
৫২. *হাজী খলীফা, কাশফুয যুনূন (বৈরুতঃ দারুল কুতুব আল-ইলমিইয়াহ, ১৪১৩ হিঃ/ ১৯৯২ খৃঃ), ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৪২৭।*
৫৩. *আল-বেদায়াহ ওয়ান নেহায়াহ ১১/৭৪ পৃঃ।*
৫৪. *আল-আছরুল আব্বাসী আল-আউয়াল, পৃঃ ১২৩।*
৫৫. *ডঃ আহমাদ আমীন, যুহরুল ইসলাম (কায়রোঃ মাকতাবাতুন নাহযাহ আল-মিছরিইয়াহ, ৩য় প্রকাশ, ১৯৬২), ২য় খণ্ড, পৃঃ ৯৪।*
৫৬. *আল-মুছত্বালাহ আন-নাহবী, পৃঃ ৮০।*
৫৭. *M.M. Sharif, A History of Muslim Philosophy (Germany: Wies Bader, 1966), Vol. 2, P. 1020.*
৫৮. *ওফায়াতুল আ'য়ান ৫/২১৮ পৃঃ।*
৫৯. *শাযারাতুয যাহাব ১/৩১৬ পৃঃ।*
৬০. *মিফতাহুস সা'আদাহ ১/১৪৩ পৃঃ।*
৬১. *ওফায়াতুল আ'য়ান ৫/২১৮; আল-খেলাফু বায়নান নাহবিইয়ীন, পৃঃ ৫২।*
৬২. *শায়খ আহমাদ আল-হামলাবী, শাযাল উরফ ফি ফান্নিছ ছরফ (মিসরঃ শারিকাতু মাকতাবাহ ওয়া মাতবা'আহ মোস্তফা বাবী হালাবী ওয়া আওলাদুহু, ২১তম সংস্করণঃ ১৩৯৯ হিঃ/১৯৭৯ খৃঃ), পৃঃ ১৯; আল-খেলাফু বায়নান নাহবিইয়ীন, পৃঃ ৫২; ব্রকলম্যান, প্রাগুক্ত, ২/১৯৭ পৃঃ।*

সংশোধনীঃ ডিসেম্বর'০৪ সংখ্যার ১৬ পৃষ্ঠার ১০নং টীকার বর্ণিত হাদীছ أَرْشِدُوْا أَخَاكُمْ 'তোমাদের ভাইকে শুধরিয়ে দাও' এ পর্যন্তই মুস্তাদরাকে হাকেম-এ বর্ণিত হয়েছে। হাকেম এটিকে ছহীহ বলেছেন এবং যাহাবী তাকে সমর্থন করেছেন। তবে আলবানী এটিকে 'যঈফ' বলেছেন *(ঐ, সিলসিলা যঈফাহ হা/৯১৪)*।

১৭ পৃষ্ঠায় مَا اَحْسَنُ السَّمَاءَ 'আহ কতই না সুন্দর আকাশ' এখানে সঠিক উচ্চারণ হবে مَا اَحْسَنَ السَّمَاءَ

কুরবানীর ফাযায়েল ও মাসায়েল

আত-তাহরীক ডেস্ক

কুরবানীর গুরুত্বঃ

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন- مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مُصَلاَّنَا– 'সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি কুরবানী করল না, সে যেন আমাদের ঈদগাহের নিকটবর্তী না হয়' *(আলবানী, ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/২৫৩২)*।

ফাযায়েলঃ

(ক) আয়েশা (রাঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'কুরবানীর দিনে রক্ত প্রবাহিত করার চেয়ে প্রিয় আমল আল্লাহ্র নিকটে আর কিছু নেই। ঐ ব্যক্তি ক্বিয়ামতের দিন কুরবানীর পশুর শিং, ক্ষুর ও লোম সমূহ নিয়ে হাযির হবে। কুরবানীর রক্ত যমীনে পতিত হওয়ার আগেই তা আল্লাহ্র নিকটে বিশেষ মর্যাদার স্থানে পৌঁছে যায়। অতএব তোমরা কুরবানী দ্বারা নিজেদের নফ্সকে পবিত্র কর' *(তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৪৭০)*। ছাহেবে মির'আত বলেন, হাদীছটির সূত্র যঈফ। তবে অন্যান্য 'শাওয়াহেদ'-এর কারণে সম্ভবতঃ তিরমিযী একে 'হাসান' বলেছেন'। তিরমিযীর অন্যতম ভাষ্যকার ইবনুল আরাবী বলেন যে, কুরবানীর ফযীলত বর্ণনায় কোন ছহীহ হাদীছ পাওয়া যায় না *(মির'আত ৫/১০৩-১০৪)*।

(খ) যিলহাজ্জ মাসের ১ম দশকের ফযীলতঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন যে, 'যিলহাজ্জ মাসের ১ম দশকের নেক আমলের চেয়ে প্রিয়তর কোন আমল আল্লাহ্র কাছে নেই। ছাহাবায়ে কেরাম বললেন, হে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)! আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদও নয়? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করলেন, জিহাদও নয়। তবে ঐ ব্যক্তি যে নিজের জান ও মাল নিয়ে বেরিয়েছে। আর ফিরে আসেনি (অর্থাৎ শাহাদাত লাভ করেছেন) *(বুখারী, মিশকাত হা/১৪৬০)*।

(গ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'আরাফার দিনের নফল ছিয়াম (যারা আরাফাতের বাইরে থাকেন তাদের জন্য) বিগত ও পরবর্তী এক বছরের গুনাহের কাফফারা হয়' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২০৪৪ 'নফল ছিয়াম' অধ্যায়)*।

মাসায়েলঃ

(১) চুল, নখ না কাটাঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'তোমাদের মধ্যে যারা কুরবানী দেওয়ার ইচ্ছা পোষণ করে, তারা যেন যিলহজ্জ মাসের চাঁদ ওঠার পর হ'তে কুরবানী সম্পন্ন করা পর্যন্ত স্ব স্ব চুল ও নখ কর্তন করা হ'তে বিরত থাকে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৪৫৯)*। কুরবানী দিতে অক্ষম ব্যক্তিগণ কুরবানীর নিয়তে এটি করলে আল্লাহ্র নিকটে তা পূর্ণাঙ্গ কুরবানী হিসাবে গৃহীত হবে' *(আবুদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/১৪৭৯; হাকেম একে ছহীহ বলেছেন এবং যাহাবী তাকে সমর্থক করেছেন)*। অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গ কুরবানীর ন্যায় ছওয়াব পাবে *(মির'আত ৫/১১৭)*।

(২) কুরবানীর পশুঃ কুরবানীর পশু আট প্রকার (১) ভেড়া বা দুম্বা (২) ছাগল (৩) গরু (৪) উট, প্রত্যেকটির নর ও মাদি *(আন'আম ১৪৪-৪৫)*। গরুর ন্যায় মহিষের যাকাতের উপরে ক্বিয়াস করে অনেকে মহিষ দ্বারা কুরবানী জায়েয বলেছেন। এগুলি ব্যতীত অন্য কোন পশু দ্বারা কুরবানী জায়েয নয় *(কিতাবুল উম্ম ২/২২৩ পৃঃ)*।

ছাগল কুরবানী করাই উত্তম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনায় থাকাকালীন সময়ে উট, গরু পাওয়া সত্ত্বেও সর্বদা দুম্বা কুরবানী দিতেন। ইসমাঈলের বিনিময়ে জান্নাতী পশুর যে কুরবানী দেওয়া হয়, সেটাও তাই ছিল। তাছাড়া মানুষের ব্যবহারিক জীবনে উট-গরুর চেয়ে ছাগল-দুম্বা-ভেড়ার প্রয়োজনীয়তা অনেক কম এবং তা অধিকাংশের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে পড়ে। তবে রক্ত প্রবাহিত করার বিবেচনায় জমহূর বিদ্বানগণের নিকটে উত্তম হ'ল উট। অতঃপর গরু অতঃপর ভেড়া বা দুম্বা অতঃপর ছাগল।

'খাসী' কুরবানী নিঃসন্দেহে জায়েয বরং উত্তম। কেননা অন্য এক বর্ণনায় পাওয়া যায় রাসূল (ছাঃ) নিজে মদীনায় মুক্বীম এমনকি মুসাফির অবস্থায়ও সর্বদা 'খাসী' কুরবানী দিতেন। ইবনু হাজার আসক্বালানী বলেন, 'খাসী কুরবানী জায়েয। যদিও অন্ডকোষ বিচ্ছিন্ন করার কারণে কেউ কেউ এটাকে খুঁৎওয়ালা পশু বলে অপসন্দ করেন। কিন্তু মূলতঃ এটি কোন খুঁৎ নয়। বরং এর ফলে গোস্ত রুচিকর হয়, দুর্গন্ধ দূরীভূত হয় ও সুস্বাদু হয় *(ফাৎহুল বারী ১০/১২ পৃঃ)*।

কুরবানীর পশু সুঠাম, সুন্দর ও নিখুঁত হওয়া চাই। স্পষ্ট খোঁড়া, স্পষ্ট কানা, স্পষ্ট রোগী ও জীর্ণশীর্ণ পশু এবং অর্ধেক কান কাটা বা ছিদ্র করা ও অর্ধেক শিং ভাঙ্গা জন্তুর দ্বারা কুরবানী সিদ্ধ নয়। এসবের চাইতে নিম্নস্তরের কোন দোষ যেমন অর্ধেক লেজ কাটা ইত্যাদি থাকলে তার দ্বারাও কুরবানী হবে না। তবে নিখুঁত পশু ক্রয়ের পর যদি নতুন করে খুঁৎ হয় বা পুরানো কোন দোষ বেরিয়ে আসে, তাহ'লে ঐ পশু দ্বারাই কুরবানী বৈধ হবে *(মির'আত ৫/৯৯)*।

(৩) 'মুসিন্নাহ' পশু দ্বারা কুরবানী করাঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন-

لاَ تَذْبَحُوْا إِلاَّ مُسِنَّةً إِلاَّ أَنْ يَّعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوْا جُذْعَةً مِّنَ الضَّأْنِ رواه مسلم

অর্থঃ 'তোমরা দুধে দাঁত ভেঙ্গে নতুন দাঁত ওঠা (মুসিন্নাহ) পশু ব্যতীত যবহ করো না। তবে কষ্টকর হ'লে এক বছর পূর্ণকারী ভেড়া (দুম্বা বা ছাগল) কুরবানী করতে পার'। জমহূর বিদ্বানগণ অন্যান্য হাদীছের আলোকে এই হাদীছে নির্দেশিত 'মুসিন্নাহ' পশুকে কুরবানীর জন্য উত্তম হিসাবে গণ্য করেছেন'। 'মুসিন্নাহ' পশু ষষ্ঠ বছরে পদার্পণকারী উট

এবং তৃতীয় বছরে পদার্পণকারী গরু বা ছাগল-ভেড়া দুম্বাকে বলা হয়। কেননা এই বয়সে সাধারণতঃ এই সব পশুর নতুন দাঁত উঠে থাকে। তবে অনেক পশুর বয়স বেশী ও হৃষ্টপুষ্ট হওয়া সত্ত্বেও সঠিক সময়ে দাঁত উঠেনা। এসব পশু দ্বারা কুরবানী করা ইনশাআল্লাহ কোন দোষের নয়।

(৪) পরিবারের সকলের পক্ষ হ'তে একটি কুরবানীই যথেষ্টঃ

(ক) আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একটি শিং ওয়ালা সুন্দর সাদা কালো দুম্বা আনতে বললেন....অতঃপর নিম্নোক্ত দো'আ পড়লেন-

بِسْمِ اللّهِ اَللّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَّمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ

'বিসমিল্লাহ; হে আল্লাহ! তুমি কবুল কর মুহাম্মাদের পক্ষ হ'তে, তার পরিবারের পক্ষ হ'তে ও উম্মতের পক্ষ হ'তে। এরপর উক্ত দুম্বা দ্বারা কুরবানী করলেন' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৪৫৪)*।

(খ) বিদায় হজ্জে আরাফার দিনে সমবেত জন মণ্ডলীকে উদ্দেশ্য করে তিনি এরশাদ করেন-

يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِيْ كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَةً وَّعَتِيْرَةً...

'হে জনগণ! নিশ্চয়ই প্রতিটি পরিবারের উপরে প্রতি বছর একটি করে কুরবানী ও আতীরাহ'। আবুদাঊদ বলেন, 'আতীরাহ' প্রদানের হুকুম পরে রহিত করা হয়েছে *(ছহীহ নাসাঈ হা/৩৯৪০; ছহীহ আবুদাঊদ হা/২৪২১)*।

(গ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পরেও ছাহাবায়ে কেরামের মধ্যে পরিবার পিছু একটা করে বকরী কুরবানীর রেওয়াজ ছিল। যেমন ছাহাবী আবু আইয়ূব আনছারী (রাঃ) বলেন,

كَانَ الرَّجُلُ يُضَحِّى بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ اَهْلِ بَيْتِهِ فَيَأْكُلُوْنَ وَيُطْعِمُوْنَ حَتَّى تَبَاهَى النَّاسُ فَصَارَتْ كَمَا تَرَى-

অর্থঃ একজন লোক একটি বকরী দ্বারা নিজের ও নিজের পরিবারের পক্ষ হ'তে কুরবানী দিতেন। অতঃপর তা খেতেন ও অন্যকে খাওয়াতেন এবং এভাবে লোকেরা বড়াই করত। এই নিয়ম নবীর যুগ হ'তে চলে আসছে যেমন তুমি দেখ্ছ' *(ছহীহ তিরমিযী হা/১২১৬; ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/২৫৪৬; মির'আত ৫/১১৪ পৃঃ)*।

(ঘ) মিশকাতের ভাষ্যকার ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী বলেন, যারা একটি ছাগল একজনের জন্য নির্দিষ্ট বলেন এবং উক্ত হাদীছগুলিকে একক ব্যক্তির কুরবানীতে পরিবারের সকলের ছওয়াবে অংশীদার হওয়ার 'তাবীল' করেন বা খাছ হুকুম মনে করেন কিংবা হাদীছগুলিকে 'মানসূখ' বলতে চান, তাদের এই সব দাবী প্রকাশ্য ছহীহ হাদীছের বিরোধী এবং তা প্রত্যাখ্যাত ও নিছক দাবী মাত্র'।

(ঙ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজ পরিবার ও নিজ উম্মতের পক্ষ হ'তে এক ও একাধিক দুম্বা, খাসী, বকরী (ছাগল), গরু ও উট কুরবানী করেছেন।

উল্লেখিত হাদীছ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, যেহেতু একজন ব্যক্তি তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে একটি কুরবানী দিলে পরিবারের সকলের জন্যই কুরবানী হয়ে যাবে তাই কুরবানী করার সময় পরিবারের সকলের কথাই নিয়ত করা উচিত।

(৫) কুরবানীতে শরীক হওয়াঃ

(ক) হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন,

كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ سَفَرٍ فَحَضَرَ الْأَضْحَى فَاشْتَرَكْنَا فِى الْبَقَرَةِ سَبْعَةً وَفِى الْبَعِيْرِ عَشَرَةً-

'আমরা আল্লাহ্র রাসূলের সাথে এক সফরে ছিলাম। এমতাবস্থায় কুরবানীর ঈদ উপস্থিত হ'ল। তখন আমরা সাত জনে একটি গরু ও দশজনে একটি উটে শরীক হলাম' *(নাসাঈ, তিরমিযী প্রভৃতি, মিশকাত হা/১৪৬৯)*।

(খ) হযরত জাবির (রাঃ) বলেন, আমরা আল্লাহ্র রাসূলের সাথে হজ্জ ও ওমরাহ্র সফরে শরীক ছিলাম।... তখন আমরা একটি গরু ও উটে সাতজন করে শরীক হয়েছিলাম' *(মুসলিম হা/১৩১৮)*। জমহুর বিদ্বানগণের মতে হজ্জের হাদ্ঈর ন্যায় কুরবানীতেও শরীক হওয়া চলবে *(মির'আত ৫/১০২)*।

(গ) হযরত আনাস (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মক্কায় (হজ্জের সফরে) ৭টি উট (অন্য বর্ণনায় এর অধিক) নহর করেছেন এবং মদীনায় (মুক্বীম অবস্থায়) দু'টি দুম্বা (একটি নিজের ও একটি উম্মতের পক্ষে) কুরবানী দিয়েছেন' *(বুখারী ১/২৩১ পৃঃ)*। অবশ্য মক্কায় নহরকৃত উটগুলি ছাহাবীদের পক্ষ থেকেও হ'তে পারে।

আলোচনাঃ ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর হাদীছটি নাসাঈ, তিরমিযী ও ইবনু মাজাহ্তে, জাবির (রাঃ) বর্ণিত হাদীছটি মুসলিম ও আবুদাঊদে এবং আনাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীছটি বুখারীতে সংকলিত হয়েছে। মুসলিম ও বুখারীতে যথাক্রমে 'হজ্জ' ও 'মানাসিক' অধ্যায়ে এবং সুনানে 'উযহিয়াহ' অধ্যায়ে হাদীছগুলি এসেছে। যেমন (১) তিরমিযী 'কুরবানীতে শরীক হওয়া' অধ্যায়ে ইবনু আব্বাস, জাবির ও আলী থেকে মোট তিনটি হাদীছ এনেছেন। যার মধ্যে প্রথম দু'টি সফরের কুরবানী ও শেষেরটিতে কোন ব্যাখ্যা নেই। (২) ইবনু মাজাহ উক্ত মর্মের শিরোনামে ইবনু আব্বাস, জাবের, আবু হুরায়রা ও আয়েশা হ'তে যে পাঁচটি হাদীছ (৩১৩১-৩৪ নং) এনেছেন, তার সবগুলিই মুসাফিরের কুরবানী সংক্রান্ত। (৩) নাসাঈ কেবলমাত্র ইবনু আব্বাস ও জাবির থেকে পূর্বের দু'টি হাদীছ (২৩৯৭-৯৮ নং)

এনেছেন। (৪) আবুদাঊদ শুধুমাত্র জাবির-এর পূর্ব বর্ণিত সফরে কুরবানীর হাদীছটি এনেছেন তিনটি ছহীহ সনদে (২৮০৭-৯ নং), যার মধ্যে ২৮০৮নং হাদীছটিতে (اَلْبَقَرَةُ) عَنْ سَبْعَةٍ وَالْجَزُوْرُعَنْ سَبْعَةٍ কোন ব্যাখ্যা নেই।

ভাগা কুরবানীঃ মিশকাত শরীফে ইবনু আব্বাস-এর হাদীছটি (নং-১৪৬৯) এবং জাবির বর্ণিত ব্যাখ্যাশূন্য হাদীছটি (নং ১৪৫৮) সংকলিত হয়েছে। সম্ভবতঃ জাবির বর্ণিত ব্যাখ্যাশূন্য হাদীছটিকে ভিত্তি করে এদেশে মুক্বীম অবস্থায় গরুতে সাত ভাগা কুরবানীর প্রথা চালু হয়েছে। অথচ ভাগের বিষয়টি সফরের সঙ্গে সম্পৃক্ত, যা ইবনু আব্বাস ও জাবির বর্ণিত বিস্তারিত হাদীছে উল্লেখিত হয়েছে। আর একই রাবীর বর্ণিত সংক্ষিপ্ত হাদীছের স্থলে বিস্তারিত ও ব্যাখ্যা সম্বলিত হাদীছ দলীলের ক্ষেত্রে গ্রহণ করাই মুহাদ্দিছগণেরর সর্ববাদীসম্মত রীতি।

তাছাড়া মুক্বীম অবস্থায় মদীনায় আল্লাহ্র নবী (ছাঃ) বা ছাহাবায়ে কেরাম ভাগে কুরবানী করেছেন বলেও জানা যায় না। দুঃখের বিষয়, বর্তমানে এদেশে কেবল সাত ব্যক্তির পক্ষ থেকে নয় বরং সাত পরিবারের পক্ষ থেকে একটি গরু কুরবানী দেওয়া হচ্ছে। উল্লেখ্য যে, মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে কুরবানী দেওয়ার কোন ছহীহ দলীল নেই।

(ঘ) 'কুরবানী ও আক্বীক্বা দু'টিরই উদ্দেশ্য আল্লাহ্র নৈকট্য হাছিল করা'- এই (ইস্তিহ্সানের) যুক্তি দেখিয়ে কিছু কিছু হানাফী বিদ্বান কুরবানীর গরু বা উটে এক বা একাধিক সন্তানের আক্বীক্বা সিদ্ধ বলে মত প্রকাশ করেছেন (যা এ দেশে অনেকের মধ্যে চালু আছে) *(হেদায়া ৪/৪৩৩; বেহেশতী জেওর (বঙ্গানুবাদ ঢাকাঃ ১৯৯০) ১/৩০০)*। ইমাম আবু ইউসুফ এই মতের বিরোধিতা করেন। ইমাম শাওকানী এর ঘোরপ্রতিবাদ করে বলেন, এটি শরী'আত। এখানে সুনির্দিষ্ট দলীল ব্যতীত কিছুই প্রমাণ করা সম্ভব নয়। বলা আবশ্যক যে, কুরবানীর পশুতে আক্বীক্বার ভাগ নেওয়ার কোন প্রমাণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বা ছাহাবায়ে কেরামের কথা ও কর্মে পাওয়া যায় না। এটি সম্পূর্ণ কল্পনা প্রসূত।

(৬) কুরবানী করার নিয়মঃ (ক) উট বাদে গরু বা ছাগলের মাথা দক্ষিণ দিকে রেখে বাম কাতে ফেলতে হবে। অতঃপর কুরবানী দাতা ধারালো ছুরি নিয়ে ক্বিবলামুখী হয়ে দো'আ পড়ে নিজ হাতে খুব জলদি যবহের কাজ সমাধা করবেন যেন পশুর কষ্ট কম হয়। এ সময় আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) নিজ ডান পা দিয়ে পশুর ঘাড় চেপে ধরতেন। যবহকারী বাম হাত দ্বারা পশুর চোয়াল চেপে ধরতে পারেন। (খ) অন্যের দ্বারা যবহ করানো জায়েয আছে। তবে এই গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতটি নিজ হাতে করা অথবা যবহের সময় প্রত্যক্ষ করা উত্তম। (গ) ঈদের ছালাত ও খুৎবা শেষ হওয়ার পূর্বে কুরবানী করা নিষেধ। করলে তাকে আরেকটি কুরবানী দিতে হবে।

(৭) যবহকালীন দো'আ ঃ (১) বিসমিল্লা-হি আল্লাহু আকবার। (২) বিসমিল্লা-হি আল্লা-হুম্মা তাক্বাব্বাল মিন্নী ওয়া মিন আহলে বায়তী (অর্থঃ আল্লাহ্র নামে। হে আল্লাহ! তুমি কবুল কর আমার ও আমার পরিবারের পক্ষ হ'তে)। এখানে কুরবানী অন্যের হ'লে তার নাম মুখে বলবেন অথবা মনে মনে নিয়ত করে বলবেন .... মিন ফুলান ওয়া মিন আহলে বায়তিহী' (অমুকের ও তার পরিবারের পক্ষ হ'তে)। এই সময় নবীর উপরে দরূদ পাঠ করা মাকরূহ। (৩) 'বিসমিল্লা-হি আল্লাহু আকবর, আল্লা-হুম্মা তাক্বাব্বাল মিন্নী কামা তাক্বাব্বালতা মিন ইবরাহীমা খালীলিকা' (...হে আল্লাহ তুমি আমার পক্ষ হ'তে কবুল কর যেমন কবুল করেছ তোমার দোস্ত ইব্রাহীমের পক্ষ থেকে)। (৪) যদি দো'আ ভুলে যান বা ভুল হবার ভয় থাকে, তবে শুধু 'বিসমিল্লাহ' বলে মনে মনে কুরবানীর নিয়ত করলেই যথেষ্ট হবে।

(৮) কুরবানীর গোস্ত বণ্টনের নিয়মঃ কুরবানীর গোস্ত এক ভাগ নিজ পরিবারের খাওয়ার জন্য, এক ভাগ পাড়া-প্রতিবেশী যারা কুরবানী করতে পারেনি, তাদের জন্য ও এক ভাগ ফক্বীর-মিসকীনের মধ্যে ছাদাক্বা করার জন্য মোট তিন ভাগ করা উত্তম। তবে কমবেশী করায় কোন দোষ নেই। কুরবানীর গোস্ত যতদিন খুশী রেখে খাওয়া যায়।

(৯) কুরবানীর পশু যবহ করা কিংবা কুটা-বাছা বাবদ কুরবানীর গোস্ত বা চামড়ার পয়সা হ'তে কোনরূপ মজুরী দেওয়া যাবে না। ছাহাবীগণ নিজ নিজ পকেট থেকে এই মজুরী দিতেন। অবশ্য ঐ ব্যক্তি দরিদ্র হ'লে হাদিয়া স্বরূপ তাকে কিছু দেওয়ায় দোষ নেই।

(১০) কুরবানীদাতার আমলঃ কুরবানীদাতা সকাল হ'তে কুরবানীর আগ পর্যন্ত কিছুই খাবেন না। বরং কুরবানীর পশুর কলিজা দ্বারা ইফতার করবেন *(বায়হাক্বী)*।

(১১) ১০, ১১, ১২ যিলহজ্জ তিনদিন যাবৎ কুরবানী দেওয়া যাবে *(মুওয়াত্ত্বা, মিশকাত হা/১৪৭৩)*।

(১২) ৯ই যিলহজ্জ ফজরের পর থেকে ১৩ই যিলহজ্জ দিনের শেষ পর্যন্ত ২৩ ওয়াক্ত ছালাত শেষে এবং অন্য সময়ে সরবে তাকবীর ধ্বনি করা সুন্নাত। তাকবীরঃ আল্লাহু আকবর আল্লাহু আকবর লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবর আল্লাহু আকবর ওয়া লিল্লাহিল হাম্দ। আল্লাহু আকবর কাবীরা, ওয়াল হামদুলিল্লাহি কাছীরা, ওয়া সুবহানাল্লাহি বুকরাতাঁও ওয়া আছীলা।

(১৩) ঈদায়নের অতিরিক্ত তাকবীর প্রথম রাক'আতে ক্বিরা'আতের পূর্বে সাত ও দ্বিতীয় রাক'আতে ক্বিরা'আতের পূর্বে পাঁচ মোট ১২ তাকবীর দিতে হয় *(তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৪৪১)*। ছাহেবে মির'আত বলেন, এটাই সর্বাধিক স্পষ্ট ও নির্দিষ্ট যে, ওটা তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত। ইমাম শাফেঈ, আওযাঈ, ইবনু হাযম তাঁরাও একথা বলেন। তবে ইমাম মালেক ও আহমাদ এটিকে তাকবীরে তাহরীমা সহ বলেন *(মির'আত ৫/৪৬ পৃঃ)*। ইমাম তিরমিযী বলেন, ১২ তাকবীরের হাদীছটির সনদ 'হাসান' এবং এটিই ঈদায়নের অতিরিক্ত তাকবীর সম্পর্কে বর্ণিত সর্বাধিক সুন্দর' বর্ণনা। ইমাম বুখারী বলেন, 'ঈদায়নের ছালাতের অতিরিক্ত তাকবীর সম্পর্কে এর চাইতে অধিক আর কোন ছহীহ রেওয়ায়াত নেই এবং আমিও এটি বলি'। ইমাম বায়হাক্বী বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে ১২ তাকবীরের উপরে মুসলমানদের আমল চালু আছে। অতএব তার উপরেই আমল করা উত্তম *(বায়হাক্বী ৩/২৯১)*।

চার খলীফা ও মদীনার শ্রেষ্ঠ সাত জন তাবেঈ ফক্বীহ সহ প্রায় সকল ছাহাবী, তাবেঈ, তিন ইমাম ও অন্যান্য শ্রেষ্ঠ ইমামগণ এবং ইমাম আবু হানীফার দুই প্রধান শিষ্য ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ (রহঃ) বারো তাকবীরের উপরে আমল করতেন। ভারতের দু'জন খ্যাতনামা হানাফী বিদ্বান আবদুল হাই লাক্ষ্ণৌবী ও আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী বারো তাকবীরকে সমর্থন করেছেন *(মির'আত ৫/৪৬ পৃঃ)*।

সাময়িক প্রসঙ্গ

হত্যা, হন্তা, হতবাক

*মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান**

হত্যা মাত্র দু'টি অক্ষরের সমন্বয়। কিন্তু এর প্রভাব ও কার্যকারিতা ব্যাপক। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, আদম (আঃ)-এর দুই পুত্র হাবিল এবং ক্বাবিল-এর বিবাহ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে উভয়ের মাঝে মতবিরোধ দেখা দিলে তাদের প্রতি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে কুরবানী করার নির্দেশ আসে। তাদেরকে বলা হয়, তোমরা কুরবানী কর, যার কুরবানী আল্লাহ কবুল করবেন সে তার অভিপ্রায় অনুযায়ী বিবাহ করবে। উভয়ে কুরবানী করলে হাবিলের কুরবানী আল্লাহ কবুল করেন। এতে ক্বাবিল ক্ষুব্ধ হয়ে হাবিলকে হত্যা করে।

সর্বপ্রথম সেই হত্যাকাণ্ডের চেয়ে পৃথিবীর মানুষ আজ আরো বিক্ষুব্ধ, দিশেহারা, হতবাক। যেকোন দিনের খবরের কাগজ খুলুন, দেখবেন সমগ্র পৃথিবীব্যাপী অশান্তি, রক্তারক্তি। হন্তার খড়্গ আজ উদ্ধত। সর্বত্র অন্যায়-অবিচার আর হাহাকার। রাষ্ট্রীয়ভাবে কোথাওনা কোথাও যুদ্ধ চলছে তো চলছেই। দলগত হানাহানি, ব্যক্তিগত সংঘাত আর রক্তাক্তের হৃদয়বিদারক বর্ণনা। পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি দেশেই প্রতিনিয়ত খুন, যখম, ডাকাতি, ধর্ষণ, বোমাবাজি আর অপহরণের সংখ্যা দ্রুতগতিতে বেড়েই চলেছে।

একদিকে মানুষ যেমন জ্ঞান-বিজ্ঞানের উচ্চ শিখরে আরোহণ করছে, অন্যদিকে তেমনি সব রকম অন্যায়ের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছাচ্ছে। মানুষের আত্মা আজ ত্রাহি ত্রাহি রবে চিৎকার করছে শান্তির জন্য। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের কথা বাদই দিলাম, আমার নিজের দেশের চিত্রটির দিকেই লক্ষ্য করি। হত্যা, অপহরণ ও হানাহানিতে দেশ কোন পর্যায়ে দাঁড়িয়েছে।

১৯৭১ সালে হত্যার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের যাত্রা শুরু হয়েছিল। রক্তের বিনিময়ে স্বাধীন সত্তা নিয়ে পৃথিবীর মানচিত্রে সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। সেই দেশকে গড়ার জন্য সবাই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে অন্তহীন জনতা আওয়াজ তুলেছিল, আসুন আমরা সোনার দেশ গড়ি। একি সোনার দেশ গড়ার চিহ্ন? মুসলমানের জাতীয় ও ব্যক্তিগত উভয় জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ইবলীসের চ্যালেঞ্জে আল্লাহ তা'আলাকে জয়ী করানো এবং পৃথিবীতে ন্যায় বিচার ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। আজ তেত্রিশ বছর হ'তে চলেছে শান্তি প্রতিষ্ঠা হয়নি। পক্ষান্তরে এই দেশ অনুন্নত ও দুর্নীতিপরায়ণ দেশ সমূহের শীর্ষ তালিকায়। সন্ত্রাসীরা দেশটিকে কুরে কুরে খাচ্ছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'ফেতনা-ফাসাদ হত্যার চেয়েও জঘন্য' *(বাক্বারাহ ২১৭)*। অথচ সন্ত্রাসীরা সে কাজটিই প্রতিনিয়ত করে যাচ্ছে, যেন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের জন্যই তারা সদা প্রস্তুত।

* সাধুর মোড়, রামচন্দ্রপুর, ঘোড়ামারা, রাজশাহী।

আমরা এমন এক যুগসন্ধিক্ষণের মুখোমুখি হয়েছি, মৃত্যু, অপহরণ, ধর্ষণ কখন কোন দিক হ'তে এসে আমাদের আক্রমণ করবে তা বলা যাবে না। জনৈক কবির ভাষায়, 'মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে'। অন্য আরেক কবি বলেন, 'জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে'? মানুষ যে মরণশীল পবিত্র কুরআনেও আল্লাহ তা'আলা বলেছেন। অসুখে-বিসুখে, দৈব দুর্ঘটনা, মহামারি, যুদ্ধ-বিগ্রহে মানুষ মারা যাচ্ছে। এগুলি স্বাভাবিক মৃত্যু তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু হন্তার হাতে প্রতিদিন যে পরিমাণ লোকের প্রাণ বিনাশ হচ্ছে, তা আমাদেরকে হতবাক করে দিচ্ছে। আমাদের বেশী দূরে যেতে হবে না, আমরা যদি বিগত ১৫/২০ বছরের পরিসংখ্যান করে দেখি, তাহ'লে দেখতে পাব যে, এ সময়ের মধ্যে হন্তারা যত মানুষকে হত্যা করেছে, তা বিগত দশ শতাব্দীরও দ্বিগুণ। শুধু হত্যা নয়, অন্যায়ের ক্ষেত্রে অপহরণ, ধর্ষণ, ডাকাতি, বোমাবাজি; হরতালের নামে সরকারী-বেসরকারী যানবাহন ভাংচুর, ইউনিভার্সিটি, অফিস-আদালত রেলপথ ইত্যাদির সম্পদ তছনছ ও অগ্নিসংযোগ পূর্বের যাবতীয় রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে।

দেশ ও জাতিকে রক্ষা করতে গিয়ে অন্যায়, অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে গিয়ে রাজপথে যে মৃত্যু হয় তা গৌরবের মৃত্যু। কিন্তু এখন আমাদের দেশে যে মৃত্যু হচ্ছে তা কিসের মৃত্যু? এ মৃত্যু যেন চরম মহামারিকেও ছাড়িয়ে গেছে। হন্তা নির্বিচারে হত্যার কাজ সম্পন্ন করছে। কখনো প্রকাশ্যে, কখনো গোপনে, কখনোবা অন্ধকারে আঘাত হেনে গা ঢাকা দিচ্ছে। একজন আরেকজনকে হত্যা করার ক্ষেত্রে হন্তার অভিসন্ধি বা প্রেরণাকে মোটিভ (মর্মধণ) বলা হয়। যে কারণে একজন হন্তা হত্যার জন্য উদ্যত হয় তাকে ইংরেজীতে মোটিভেশন বলে। এগুলি নিম্নে তুলে ধরা হ'লঃ

সম্পত্তির জন্য হত্যাঃ সমাজে হত্যার অন্যতম কারণের একটি সম্পত্তির অধিকার ভোগ দখলকে কেন্দ্র করে হত্যা। এতে মারামারি, হানাহানি ও রক্তাক্তের সূচনা হয়।

অর্থনৈতিক কারণঃ রক্ত পিপাসুরা রাতারাতি কোটিপতি হওয়ার একান্ত বাসনায় মানুষকে দিন-দুপুরে হত্যা করে। আবার কেউ দারিদ্র্যের কারণে অন্য কোন উপায় অনুসন্ধান না করে হত্যার পথ বেছে নেই।

প্রেম ঘটিত হত্যাঃ এ হত্যা সর্বময় ও সর্বকালের। একে অপরকে কথিত ভালবাসার অবৈধ সূচনাই এ হত্যার পথ প্রশস্ত করে। বিবাহের শাশ্বত রীতি নারী-পুরুষকে বেঁধে দেয় এক অদৃশ্য প্রতিশ্রুতির বন্ধনে। স্বামী হবেন শুধুমাত্র স্ত্রীর, অনুরূপ স্ত্রীও হবেন কেবলমাত্র স্বামীর। কিন্তু পরকীয়া প্রেমের কারণে কখনো এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয়ে দাম্পত্য জীবনের বাঁধ ভেঙ্গে যায়। তখনি খুলে যায় হত্যার দ্বার।

রাজনৈতিক হত্যাঃ রাজনৈতিক দলের লেজুড়বৃত্তিতে দেশে সৃষ্টি হয় অস্থিরতা; অস্থিরতা হ'তে সৃষ্টি হয় সংঘর্ষ, সংঘাত, হত্যা। এ হ'ল দেশপ্রেমের সোল এজেন্সীর রাজনীতি। আমাদের দেশের অনেক রাজনীতিবিদ আছেন যারা

পরস্পরকে স্বাধীনতা বিরোধী, মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী বলে গালমন্দ হ'তে শুরু করে শেষ পর্যন্ত মারণাস্ত্র প্রয়োগ করে। বিশেষভাবে লক্ষণীয় হ'ল, শিক্ষাঙ্গনে সেই রাজনৈতিক নেতারা সরলমনা ছাত্র-ছাত্রীদেরকে প্রভাবিত করে এবং অতি সুন্দর আঙ্গিনা ও পরিবেশকে করে তুলে উত্তেজনাপূর্ণ ও আতংকের রাজ্য। ফলে রাজনৈতিক হানাহানি অনিবার্য হয়ে উঠে। ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা পড়তে এসে, আদর্শ শিখতে এসে অবশেষে লাশ হয়ে ফিরে যায়।

এরূপভাবে রাজনীতিবিদরা সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে সর্বদা পারস্পরিক সংঘাত ও হত্যার মত অতি জঘন্য কাজে লিপ্ত থাকে। এভাবে হত্যার ভাইরাস এক প্রান্ত হ'তে অন্য প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে। মানুষের মনগড়া মতবাদ ও জীবন পদ্ধতি মানুষের সমস্যার সমাধান তো দূরের কথা সমাজে পাহাড়সম অশান্তি, অরাজকতা, হানাহানির সৃষ্টি করে। দেশে বর্তমানে পারিবারিক, সামাজিক মূল্যবোধ হীনতার পর্যায়ে পৌঁছেছে। ধর্মীয় ও নৈতিকতার অবক্ষয়ের কারণে পশুত্বের পর্যায়ে চলে গেছে। ভোগবাদিতার যে ঘূর্ণাবর্তে আবর্তিত হচ্ছে তা বন্যার পানির মতই বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। যা শীঘ্রই সমগ্র দেশকে প্লাবিত করবে।

উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়েঃ দেশে যতসব হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হচ্ছে একশ্রেণীর তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা সব দোষ ইসলামপন্থীদের উপর চাপিয়ে দিয়ে নিজেরা মুক্তি পেতে চায়। অথচ ইসলাম এরূপ জঘন্য কাজকে আদৌ অনুমোদন করে কি? ইসলাম তো পৃথিবীতে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে, যালেমের হাত হ'তে মযলূমকে রক্ষা করতে শিক্ষা দেয়। অথচ দুর্নীতিবাজ ও সুযোগ সন্ধানীরা আজ ইসলাম সম্পর্কে না জেনে তার বিরুদ্ধে প্রচারণা চালাচ্ছে।

আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে বেঁচে থাকার অধিকার সবাইকে দিয়েছেন। এটা হচ্ছে বান্দার অধিকার বা হক্কুল ইবাদ। তাই কেউ কাউকে হত্যা করলে তার অধিকারের উপরে হস্তক্ষেপ করা হয়। যে অপরাধ আল্লাহ তা'আলাও ক্ষমা করতে পারেন না। ইসলাম ধর্মীয় যুদ্ধের ক্ষেত্রেও অহেতুক কাউকে হত্যা করতে নিষেধ করেছে। এমনকি কোন ফলবান বৃক্ষও যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেদিকেও সতর্ক দৃষ্টি রাখতে বলা হয়েছে। যেকোন প্রকার অন্যায়, অত্যাচার থেকে সর্বদা বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছে ইসলাম। কারণ মযলূমদের বুকফাটা আর্তনাদ আল্লাহ তা'আলা শীঘ্রই কবুল করে থাকেন। প্রাক ইসলামী যুগেও আরব দেশে হত্যা, খুন, রাহাজানি চলত যুগ যুগ ধরে। কিন্তু তারও একটা সীমা ছিল। রজব, যুলক্বা'দাহ, যুলহিজ্জাহ ও মহররম এই চারটি মাসে তারা কখনো যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হ'ত না। এছাড়া তারা কখনো অতিথিকে হত্যা করত না। হোকনা সে অতিথি চরম শত্রু। তবে এক হত্যার প্রতিশোধ নিতে বছরের পর বছর যুদ্ধ লেগেই থাকত। ইসলাম এসে তা চিরতরে রহিত করেছে এবং বিনিময়ে শান্তির রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছে।

আজকে সেই শান্তির বাণীবাহক ইসলামকে সন্ত্রাসী বলে অপবাদ দেয়া হচ্ছে। সন্ত্রাসী কে, কাদের ছত্রছায়ায় সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড সংঘটিত হচ্ছে, কিভাবে সন্ত্রাসী দল গড়ে উঠছে, তা খুঁজে বের করার জন্য পরিশ্রম করতে হবে না। দেশের রাজনীতিকদের নিজ দলীয় কার্যক্রমকে ঠিক রাখতে কিছু গডফাদারদেরকে লালন করতে হয়। আর এসব গডফাদাররা সাধারণত এসে থাকে অতি গরীব, সহায়-সম্বলহীন কিশোর-তরুণ ও উঠতি বয়সের যুবকদের মধ্যে হ'তে। যে সময় তারা নিজেদেরকে আদর্শবান ও সুশিক্ষিত করে গড়ে তুলবে, সে সময় তাদের হাতে তুলে দেয়া হচ্ছে লাঠি-সোটা, বোমা, পিস্তল, কাটা রাইফেল ইত্যাতি মারণাস্ত্র। ধূর্ত রাজনীতিকরা এ সমস্ত ক্ষুদে ক্যাডারদের হরতালে, অবরোধে, ধর্মঘটে পিকেটার হিসাবে রাজপথে নামিয়ে দিচ্ছে। শিখাচ্ছে ভাংচুর ও বিশৃঙ্খলার জঘন্য অপকর্ম। অতঃপর তারাই একদিন কুখ্যাত সন্ত্রাসী, মাস্তান, চাঁদাবাজ ও হন্তা হয়ে গড়ে উঠছে। ফলে সমাজে মনুষ্যত্ব চাপা পড়ে জন্ম নিচ্ছে পাশবিকতা, হিংস্রতা।

হত্যা এবং সন্ত্রাস বৃদ্ধিতে ইলেকট্রিক মিডিয়া যে বিশেষ ভূমিকা রাখে তা অনস্বীকার্য। হত্যা-সন্ত্রাসের উৎস প্রচার মাধ্যমগুলিতে যে অশালীন চিত্রপ্রদর্শনী চলছে, তাতে কোন জাতি সভ্য থাকতে পারে না। প্রশ্ন হ'ল, হত্যা, সন্ত্রাস করতে ব্যয়বহুল যে অস্ত্রের প্রয়োজন তা যোগান দিচ্ছে কে? এর সহজ জবাব হ'ল, একমাত্র দেশী-বিদেশী ইসলাম বিরোধী চক্র। কারণ তারা অবলোকন করছে যে, আগামীতে ইসলামই হবে একমাত্র জীবন ব্যবস্থা। যেখানে থাকবে না কোনরূপ হানাহানি, রক্তারক্তি। বিশ্ব মানবতাকে এই শ্রেষ্ঠ সভ্যতা উপহার দিবে এই ইসলাম যা সব ধরনের অসভ্য, অনাচার এবং পঙ্কিলতা হ'তে মুক্ত, পবিত্র। সুতরাং ইসলামের শনৈঃশনৈ অগ্রযাত্রাকে রুখতেই হবে তা যেকোন দেশেই হোক না কেন। তাই ইসলামের নামে সন্ত্রাসী, মৌলবাদী বলে আখ্যা দিচ্ছে। ইসরাঈল সহ ব্রাহ্মণ্যবাদী ভারত দেশীয় এজেন্টদের মাধ্যমে আমাদের দেশে অসংখ্য মারণাস্ত্রের যোগান দিচ্ছে।

ইসরাঈলের সঙ্গে ভারতের সামরিক সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষরের পর থেকে অব্যাহতভাবে বাংলাদেশে বোমা হামলা চলছে, হত্যা করা হচ্ছে নির্দোষ, নিরীহ লক্ষ লক্ষ জনসাধারণকে। শাহ্জালাল মাযারে কয়েকবার বোমা হামলা, ২১ আগষ্টের বোমা হামলা ইত্যাদির জন্য সেই সমস্ত মারণাস্ত্রই দায়ী। দেশী-বিদেশী চক্রান্তের কারণে এই সমস্ত ঘটনা সংঘটিত হচ্ছে তাতে সন্দেহ নেই।

প্রশ্ন হচ্ছে, এ বিষাক্ত অভিশাপ থেকে মুক্তির কি কোন পথ নেই? অবশ্যই আছে। মানবতার মুক্তির জন্য প্রায় সাড়ে ১৪০০ বছর পূর্বে সেই পথের সন্ধান দিয়েছে ইসলাম। ইসলাম কখনও সন্ত্রাসকে প্রশ্রয় দেয় না। তাই মুহাম্মাদ (ছাঃ) আজীবন সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে গেছেন। সন্ত্রাস নিরসনে সন্ত্রাসীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির বিধানে ইসলামের ভূমিকা অগ্রগণ্য। কিন্তু হায়! আমাদের দেশের প্রায় ৯০% মানুষ মুসলমান হ'লেও এদেশে ঘোষিত আইন ইসলামী নয়। শান্তির পক্ষে যা কিছু ইসলাম তাই প্রতিষ্ঠা করতে চায়। অতএব জাতীয় ব্যাধি সন্ত্রাস থেকে মুক্তি পেতে হ'লে ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠা অনস্বীকার্য।

দিশারী

হে হক্ব পিয়াসী মুমিন! প্রতারণা হ'তে সাবধান

মুযাফফর বিন মুহসিন

(শেষ কিস্তি)

তিনঃ তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ পৃথক ছালাত। তাহাজ্জুদ ৮ বা ১১ রাক'আত যা শেষ রাতে পড়তে হয়। আর তারাবীহ ২০ রাক'আত যা রাত্রির প্রথম অংশে পড়তে হয়। বুখারী মুসলিমে বর্ণিত মা আয়েশা (রাঃ)-এর হাদীছ দ্বারা তাহাজ্জুদ ছালাত বুঝানো হয়েছে।

পর্যালোচনাঃ ২০ রাক'আত প্রমাণ করার জন্যই তাদের এই কুট মন্তব্য। ছহীহ বুখারীর অনুবাদের নামে প্রতিবাদকারী শায়খুল হাদীছ মাওলানা আজিজুল হকও আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত ১১ রাক'আতের ছহীহ হাদীছের ব্যাখ্যায় দু'টি পৃথক ছালাত বলে আলোচনা করেছেন।[৩৯] মূলতঃ যারাই এরূপ যুক্তি পেশ করেছেন তারাই অজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন। বরং তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ দু'টি এক কথায় রাত্রির ছালাত। তাহাজ্জুদ শেষ রাত্রির ছালাত এবং সেই ছালাতই রামাযান মাসে এশার পর থেকে পড়াকে 'তারাবীহ' বলে।

চ্যালেঞ্জ দাতাগণ ভালভাবেই জানেন যে, প্রশ্নকারী আয়েশা (রাঃ)-কে রামাযানে রাসূলের রাত্রির ছালাত কেমন ছিল বলেই প্রশ্ন করেছিল। তার উত্তরেই আয়েশা (রাঃ) ১১ রাক'আতের কথা বলেন।

দ্বিতীয়তঃ রাসূল (ছাঃ) যে তিন দিন তারাবীহ পড়েছিলেন, সে দিনগুলিতে তাহাজ্জুদ পড়েননি। যেমন- অন্য হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সাহারীর সময় পর্যন্ত তারাবীহ্র ছালাত দীর্ঘ করতেন তাতে ছাহাবায়ে কেরাম সাহারী খাওয়া ছুটে যাওয়ার আশংকা করতেন। যেমন- فَقَامَ بِنَا حَتَّى خَشِيْنَا أَنْ تَفُوْتَنَا الْفَلاَحُ 'আমাদের নিয়ে এত দীর্ঘ সময় ধরে ছালাত পড়লেন, যাতে আমরা সাহারী খাওয়া ছুটে যাওয়ার আশংকা করছিলাম'।[৪০] তাহ'লে সেই রাতগুলিতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাহাজ্জুদ ছালাত কখন পড়লেন?

তৃতীয়তঃ অনুরূপ ওমর (রাঃ) উবাই ও তামীম দারীকে যে ১১ রাক'আত তারাবীহ পড়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন, সেই ছহীহ হাদীছের শেষাংশেও বলা হয়েছে যে, 'ক্বিরাআত লম্বা হওয়ার কারণে অবশেষে আমরা লাঠির উপর ভর দিতাম এবং ফজরের ছালাতের সময় হওয়ার উপক্রম হ'লে ছালাত শেষ করে চলে আসতাম' (فَمَا كُنَّا نَنْصَرِفُ إِلاَّ فِىْ فُرُوْعِ الْفَجْرِ)।[৪১] অতএব ছাহাবীদের যুগেও যে একই নিয়ম চালু ছিল তা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট।

চতুর্থতঃ অন্য আরেকটি হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّىْ مَا بَيْنَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلاَةِ الْعِشَاءِ إِلَى الْفَجْرِ إِحدى عَشْرَةَ رَكْعَةً- 'নবী করীম (ছাঃ) এশার ছালাত শেষ করার পর হ'তে ফজর পর্যন্ত মাত্র ১১ রাক'আত ছালাত আদায় করতেন'।[৪২]

পঞ্চমতঃ ইমাম বুখারী (রহঃ) মা আয়েশার হাদীছটি যেমন 'তাহাজ্জুদ' অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন, তেমনি كتاب صلاة التراويح বলে 'তারাবীহ' অধ্যায়েও বর্ণনা করেছেন। ফলে তিনি যেমন তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ একই ছালাত বলে প্রমাণ করেছেন, তেমনি তারাবীহ্র ছালাত যে আট রাক'আত তাও প্রমাণ করেছেন। ফালিল্লাহিল হাম্দ।

উল্লেখ্য যে, ইমাম বুখারী উক্ত শিরোনামে অধ্যায় রচনা করলেও ভারত উপমহাদেশে ছাপা বুখারী শরীফ থেকে উক্ত শিরোনাম উৎখাত করা হয়েছে। কারণ হ'ল, উপমহাদেশের ছহীহ বুখারীর পাঠদান ও পাঠগ্রহণকারী লক্ষ লক্ষ শিক্ষক-ছাত্র যদি দেখেন যে, ইমাম বুখারী (রহঃ) 'তারাবীহ্র ছালাত' শিরোনামে অধ্যায় রচনা করে সেখানে ৮ রাক'আত তারাবীহ্র হাদীছকে স্থান দিয়েছেন, তাহ'লে তাদের মনে বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়ে যাবে যে, তারাবীহ্র ছালাত ৮ রাক'আত; এর অধিক ২০ বা ততোধিক নয়। কিন্তু প্রশ্ন হ'ল, বুখারী শরীফ কি শুধু উপমহাদেশেই ছাপানো হয়? সিরিয়া, মিসর, কুয়েত, সঊদী আরবসহ অন্যান্য দেশে যত বার ছাপানো হয়েছে, সেখানেই উক্ত শিরোনাম বহাল রয়েছে, তা পুরাতন হোক আর নতুন হোক। হক্ব গোপন করার এ ধরণের মর্মান্তিক প্রচেষ্টা আর কত দিন চলবে!

আল্লামা ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী (রহঃ) বলেন, তারাবীহ, ক্বিয়ামে রামাযান, ছালাতুল লায়ল, তাহাজ্জুদ সব একই বিষয় এবং একই ছালাতের নাম।

---

৩৯. ঐ, বঙ্গানুবাদ বোখারী শরীফ (ঢাকাঃ হামিদিয়া লাইব্রেরী, এপ্রিলঃ ২০০২), ১/৩০৫ পৃঃ, হা/৬০৮-এর ব্যাখ্যা দ্রঃ।

৪০. আবুদাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/১২৯৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত ৩য় খণ্ড, হা/১২২৪ 'রামাযান মাসে রাত্রির ছালাত' অনুচ্ছেদ।

৪১. ছহীহ ইবনু খুযায়মাহ ৪/১৮৬ পৃঃ; মুওয়াত্ত্বা মালেক ১/১১৫ পৃঃ 'রামাযান মাসে রাত্রির ছালাত' অনুচ্ছেদ; মিশকাত হা/১৩০২; বঙ্গানুবাদ ৩য় খণ্ড, হা/১২২৮।

৪২. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১১৮৮; ছহীহ আবুদাউদ হা/১২০৭; ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/১১২৫ 'রাত্রির ছালাত কত রাক'আত' অনুচ্ছেদ।

كونها أعلم بحال النبى صلى الله عليه وسلم ليلا من غيرها-

'তবে এর সনদ যঈফ। এছাড়া আয়েশা (রাঃ)-এর এই হাদীছের বিরোধী যা বুখারী মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে। সাথে সাথে রাসূল (ছাঃ)-এর রাত্রিকালীন অবস্থা সম্পর্কে অন্যান্যদের চেয়ে আয়েশা (রাঃ)-ই সর্বাধিক অবগত'।[৪৫] এমনকি হানাফী আলেমগণও এমনটি বলেছেন। যেমন-

আল্লামা ইবনুল হুমাম (মৃঃ ৬৮১ হিঃ) হানাফী ২০ রাক'আতের বর্ণনাকে যঈফ বলার সাথে সাথে বলেন, 'এছাড়া ছহীহ হাদীছের বিরোধী'।[৪৬] অর্থাৎ মা আয়েশা বর্ণিত হাদীছের বিরোধী।

প্রখ্যাত হানাফী আলেম আল্লামা যায়লাঈ (মৃঃ ৭৬২ হিঃ) ২০ রাক'আতের হাদীছকে যঈফ সাব্যস্ত করার পর বলেন,

ثم إنه مخالف للحديث الصحيح عن أبى سلمة عبد الرحمن أنه سأل عائشة...

'এতদসত্ত্বেও আবু সালামাহ জিজ্ঞাসিত আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত ছহীহ হাদীছের সরাসরি বিরোধী'।[৪৭] অতএব তাদের বক্তব্যেও প্রমাণিত হ'ল যে, মা আয়েশার হাদীছ দ্বারা তারাবীহকেই বুঝানো হয়েছে।

চারঃ মসজিদে হারাম ও নববীতে আজ পর্যন্ত ২০ রাক'আতই পড়া হয়। তাই এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, ছাহাবাদের যুগ থেকে এই ধারা চলে আসছে।

পর্যালোচনাঃ মসজিদে হারাম ও নববীর আমলই যদি দলীল হয়, তাহ'লে শুধু তারাবীহর ক্ষেত্রে কেন? অন্যান্য আমল সমূহের ক্ষেত্রেও তা হওয়া আবশ্যক। অথচ এই রামাযানেই সেখানে শেষ দশকের পাঁচটি বেজোড় রাতেই লায়লাতুল ক্বদর অনুসন্ধান করা হয়, কিন্তু এদেশে তারা কেন শুধু ২৭ তারিখ পালন করেন? সেখানে এক ছা' সমপরিমাণ খাদ্য শস্য দ্বারা ফিৎরা দেওয়া হয়, কিন্তু তারা কেন অর্ধ ছা' গমের হিসাবে টাকা দ্বারা ফিৎরা দেন? সেখানে ১২ তাকবীরে ঈদের ছালাত পড়া হয়, কিন্তু তারা কেন ৬ তাকবীরে পড়েন? এরূপভাবে দেখতে গেলে প্রায় সকল আমলই সেখানকার বিপরীত হবে। কেবল স্বার্থের ক্ষেত্রে সেখানকার উদ্ধৃতি পেশ করা কি কপটতা নয়?

তাছাড়া সঊদী আরবের উক্ত দুই মসজিদ ছাড়া অন্যান্য সকল মসজিদেই ৮ রাক'আত তারাবীহ পড়া হয়। এক্ষেত্রে তাদের কোন বক্তব্য আছে কি? মোট কথা হ'ল আমরা মক্কা-মদীনার অনুসরণ করি না, বরং পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অনুসরণ করি। তবে সঠিক কথা এই যে,

৪৫. ফাৎহুল বারী ৪/৩১৯, পৃঃ, হা/২০১৩-এর আলোচনা দ্রঃ।
৪৬. ইবনুল হুমাম, ফাৎহুল ক্বাদীর শারহে হেদায়াহ (পাকিস্তানঃ আল-মাকতাবাতুল হাবীবিয়াহ, তাবি), ১/৪০৭ পৃঃ।
৪৭. আল্লামা হাফেয যায়লাঈ, নাছবুর রায়াহ (রিয়াযঃ আল-মাকতাবাতুল ইসলামিয়াহ, ১৯৭৩ খৃঃ/১৩৯৩ হিঃ), ২/১৫৩ পৃঃ।

لأنه لم تثبت من رواية صحيحة ولا ضعيفة أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى فى ليالى رمضان صلاتين إحدهما التراويح والأخرى التهجد فالتهجد فى غير رمضان هو التراويح فى رمضان-

'কারণ ছহীহ কিংবা যঈফ কোন বর্ণনার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়নি যে, রাসূল (ছাঃ) রামাযানের রাত্রিতে দুই ধরনের ছালাত আদায় করেছেন, যার একটি তারাবীহ অন্যটি তাহাজ্জুদ। সুতরাং রামাযান ব্যতীত অন্য মাসে যেটি তাহাজ্জুদ, রামাযান মাসে সেটিই তারাবীহ'।[৪৩]

আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী হানাফী (রহঃ) বলেন,

ولم يثبت فى رواية من الروايات أنه عليه السلام صلى التراويح والتهجد عليحدة فى رمضان بل طول التراويح وبين التراويح والتهجد فى عهده عليه السلام لم يكن فرق فى الركعات بل فى الوقت والصفة-

'বর্ণনা সমূহের মধ্য হ'তে কোন একটি বর্ণনা দ্বারাও প্রমাণিত হয়নি যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রামাযান মাসে তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ পৃথকভাবে আদায় করেছেন, বরং তারাবীহর ছালাতই দীর্ঘ হ'ত। আর তাঁর যুগে তারাবীহ ও তাহাজ্জুদের রাক'আতগত কোন পার্থক্য ছিল না, বরং পার্থক্য ছিল কেবল সময়ে এবং গুণে'। অতঃপর তিনি বলেন, تلك صلاة واحدة إذا تقدمت سميت باسم التراويح إذا تأخرت سميت باسم التهجد 'এটা একই ছালাত; যখন রাতের প্রথমাংশে পড়া হবে তখন তাকে তারাবীহ বলা হবে, আর যখন শেষাংশে পড়া হবে তখন তাকে তাহাজ্জুদ বলা হবে'।[৪৪] মূলতঃ অজ্ঞতা অথবা আত্ম-অহংকার বলে তারাবীহ ও তাহাজ্জুদকে পৃথক বলে জনগণকে ধোকা দেওয়া হয়েছে।

* মা আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছটি যে তারাবীহ সংক্রান্ত তাতে সকল মুহাদ্দিছই একমত। দলীয় স্বার্থে আঘাত লাগার কারণে তারা কেবল তাহাজ্জুদের কথা বলছেন। যেমন- ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) আয়েশার হাদীছের আলোচনায় ইবনু আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত বিশ রাক'আতের হাদীছটি বর্ণনা করে বলেন, فإسناده ضعيف وقد عارضه حديث عائشة هذا الذى فى الصحيحين مع

৪৩. মির'আতুল মাফাতীহ, ৪/৩১১ পৃঃ হা/১৩০৩-এর আলোচনা দ্রঃ।
৪৪. ফায়যুল বারী ২/৪২০ পৃঃ।

উক্ত দুই মসজিদে ১০ রাক'আত পড়িয়ে একজন ইমাম চলে যান। পরে অন্যজন এসে ১০ রাক'আত পড়ান। অতঃপর বিতর পড়েন। ফলে সেখানে দু'টি জামা'আত হয়, যাতে ব্যস্ত লোকেরা শেষের জামা'আত ধরতে পারে। এরূপভাবে বর্তমানে ঢাকাতেও অনেক মসজিদে হচ্ছে। এর দ্বারা একজন ইমামের একটানা ২০ রাক'আত বুঝানো হয় না।

ছাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকে উক্ত দুই মসজিদে ২০ রাক'আতের আমল চলে আসছে একথা যে ভ্রান্তিপূর্ণ, তা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। কারণ ছাহাবীগণের যুগে যে ২০ রাক'আত ছিল না, তা প্রমাণিত হয়েছে। বরং সম্ভবতঃ এই জামা'আতের ধারা চালু হয়েছে ছাহাবীদের যুগ শেষ হওয়ার অনেক পরে, দীর্ঘ ক্বিয়ামের আশায় রাক'আত সংখ্যা বৃদ্ধি করার মাধ্যমে। যেমনটি ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) ইঙ্গিত দিয়েছেন।[৪৮]

পাঁচঃ দুই সালাম বা চার রাক'আত পড়ার পর বিশ্রাম নেয়াকে 'তারাবীহ' বলে। উক্ত তারাবীহ শব্দটি বহুবচন। সেজন্য কমপক্ষে ১২ রাক'আত না হওয়া পর্যন্ত ৮ রাক'আতে তারাবীহ হয় না। সুতরাং 'তারাবীহ' শব্দটি বিশ্লেষণ করলেও ২০ রাক'আতই প্রমাণিত হয়।

পর্যালোচনাঃ তাদের এ যুক্তিও চিরন্তন সত্যকে নস্যাৎ করার ব্যর্থ ও মিথ্যা কৌশল মাত্র। কারণ মা আয়েশা (রাঃ)-এর বর্ণনাতেই তিনটি বৈঠকের উল্লেখ রয়েছে। তাছাড়া শরী'আতে দুইকেও বহুবচন গণ্য করা হয়। এক্ষণে তাদের কথা মেনে নিলেও তা কেবল ২০ হবে কেন, তার কমবেশীও হ'তে পারে। পক্ষান্তরে পাঁচ তারাবীহর ছহীহ কোন ভিত্তি নেই। অতএব যুক্তি নয়, বরং রাসূলের হাদীছের প্রতি আত্মসমর্পণ করুন।

ছয়ঃ সর্ব বিবেচনায় তারাবীহর ছালাত ২০ রাক'আত ৮ রাক'আত নয়। কোন একজন ছাহাবী, তাবেঈ, তাবে-তাবেঈও ৮ রাক'আতের কথা বলেননি। এমনকি পরবর্তী যুগেও কোন মুহাদ্দিছ, ফক্বীহ, মুফাসসিরও বলেননি। ১২৮৪ হিজরীতে আকবরাবাদে সর্বপ্রথম একজন গাইর মুক্বাল্লিদ আলেম ৮ রাক'আতের মত পোষণ করেন।

পর্যালোচনাঃ তাদের উপরোক্ত দাবী সমূহ যে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও শরী'আত বিরোধী তা আমরা প্রমাণ করেছি। এক্ষণে তারাবীহর ছালাত যে আট রাক'আত, তা নিম্নে অকাট্য দলীল সমূহের আলোকে পেশ করা হ'লঃ

(١) عَنْ أَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا كَيْفَ كَانَتْ صَلاَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (بِاللَّيْلِ) فِىْ رَمَضَانَ؟ فَقَالَتْ مَا كَانَ يَزِيْدُ فِىْ رَمَضَانَ وَلاَ فِىْ غَيْرِهَا عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّىْ أَرْبَعًا فَلاَ تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّىْ أَرْبَعًا فَلاَ تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّىْ ثَلاَثًا-

(১) 'আবু সালামাহ ইবনু আবদুর রহমান (রাঃ) একদা মা আয়েশা (রাঃ)-কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর রামাযানের রাতের[৪৯] ছালাত কেমন ছিল বলে জিজ্ঞেস করেন। আয়েশা (রাঃ) উত্তরে বলেন, রাসূল (ছাঃ) রামাযান মাসে এবং রামাযানের বাইরে অন্য মাসে রাতের ছালাত এগার (১১) রাক'আতের বেশী আদায় করতেন না। তিনি প্রথমে (২+২) চার রাক'আত পড়েন। তুমি (আবু সালামাহ) তার সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস কর না। অতঃপর তিনি (২+২) চার রাক'আত পড়েন। তুমি তার সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস কর না। অতঃপর তিনি তিন রাক'আত (বিতর) পড়েন'।

বর্ণিত হাদীছটি সর্বাধিক বিশুদ্ধ গ্রন্থ বুখারী ও মুসলিম সহ ১১-টির অধিক হাদীছগ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। বিশেষ করে ইমাম বুখারী (রহঃ) كتاب صلاة التراويح 'তারাবীহ্র ছালাত' অধ্যায়ে এটি বর্ণনা করেছেন।[৫০] তাছাড়া তিনি আরো দু'টি অধ্যায়ে হাদীছটি নিয়ে এসেছেন।[৫১] ইমাম মুসলিম একই অধ্যায়ে ভিন্ন ভিন্ন সনদে দু'টি হাদীছ বর্ণনা করেছেন।[৫২] সুতরাং এ হাদীছের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে আলোচনার প্রশ্নই উঠে না।

উক্ত হাদীছ থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, রামাযান মাসে হোক আর অন্য মাসে হোক, রাসূল (ছাঃ) রাত্রির ছালাত ১১ রাক'আতই পড়তেন, এর বেশী নয়। যার আট রাক'আত 'তারাবীহ' বা 'তাহাজ্জুদ' আর তিন রাক'আত বিতর। আরো প্রমাণিত হ'ল যে, তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ একই ছালাত, ভিন্ন কোন ছালাত নয়। তাই ইমাম বুখারী হাদীছটি 'তাহাজ্জুদ' ছালাতের অধ্যায়েও বর্ণনা করেছেন। সাথে সাথে উক্ত হাদীছের সনদ সম্পর্কে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলা যায় যে, রাসূল (ছাঃ)-এর রাত্রির ছালাত অর্থাৎ তারাবীহ ও তাহাজ্জুদের রাক'আত সংখ্যার ব্যাপারে এর চেয়ে অধিক বিশুদ্ধ বর্ণনা আর নেই।

---

৪৮. ঐ, মাজমূ'উ ফাতাওয়া, ২৩/১১৩ পৃঃ।

৪৯. ছহীহ মুসলিম হা/১৭২৩, এ হাদীছে 'রাত' শব্দটির উল্লেখ রয়েছে।

৫০. ছহীহ বুখারী হা/২০১৩, ১/২৬৯ পৃঃ; মুসলিম হা/১৭২০ ও ১৭২৩, ১/২৫৯ পৃঃ; ছহীহ আবুদাউদ হা/১৩৪১; ছহীহ তিরমিযী হা/৪৪০; ছহীহ নাসাঈ হা/১৬৯৬; ছহীহ ইবনু খুযায়মাহ হা/১১৬৬; মুওয়াত্ত্বা মালেক (বৈরুত ছাপা), ১/১২০ পৃঃ; আহমাদ ৬/৩৬-৩৭ ও ১০৪ পৃঃ; বায়হাক্বী; সুনানুল কুবরা হা/৪৬১৪, ২/৬৯৮ পৃঃ; ছহীহ আবু আওয়ানাহ ২/৩২৭ পৃঃ; নাসাঈ, সুনানুল কুবরা ২/৬০৯ পৃঃ; ঐ, আল-মুজতবা ২/৭২১ পৃঃ প্রভৃতি।

৫১. বুখারী হা/১১৪৭ ও ৩৫৬৯, ১/১২৬ ও ১/৫০৩-৪পৃঃ।

৫২. মুসলিম হা/১৭২০ ও ১৭২৩, ১/২৫৯ পৃঃ।

আরো উল্লেখ্য যে, হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে মা আয়েশা (রাঃ)-এর মাধ্যমে। আর রাসূল (ছাঃ)-এর রাত্রিকালীন অবস্থা সম্পর্কে অন্যান্যদের চেয়ে মা আয়েশা (রাঃ)-ই যে সবচেয়ে বেশী জানবেন, একথা বলার অপেক্ষা রাখে না। যেমনটি হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (৭৭৩-৮৫২ হিঃ) উক্ত হাদীছের আলোচনায় বলেছেন'।[৫৩] সুতরাং রাসূল (ছাঃ)-এর প্রকৃত অনুসারীদের জন্য এই একটি হাদীছই যথেষ্ট।

(٢) عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ شَهْرِ رَمَضَانَ ثَمَانَ رَكْعَاتٍ وَأَوْتَرَ... رواه ابن خزيمة وابن حبان فى صحيحهما-

(২) জাবের ইবনু আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) রামাযান মাসে আমাদের সাথে ৮ রাক'আত ছালাত আদায় করেন এবং বিতর পড়েন...।[৫৪] হাদীছটি কয়েকটি সূত্রে হাসান সনদে বর্ণিত হয়েছে।[৫৫]

ইমাম যাহাবী (৬৭৩-৭৪৮ হিঃ) তার 'মীযানুল ই'তেদাল' গ্রন্থে উক্ত হাদীছটি উল্লেখ করার পর বলেন, إسناده وسط 'হাদীছটির সনদ মধ্যম স্তরের' অর্থাৎ হাসান।[৫৬] ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) ইমাম যাহাবী সম্পর্কে বলেন, الذهبى من أهل الاستقراء التام فى نقد الرجال 'যাহাবী (রহঃ) রাবীদের জীবন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করণের ক্ষেত্রে সম্পূরক অনুসন্ধানীগণের অন্যতম'।[৫৭] এজন্য তিরমিযীর ভাষ্যকার আবদুর রহমান মুবারকপুরী (১২৮৩-১৩৫৩হিঃ) বলেন, 'অতএব যাহাবী কোন হাদীছ সম্পর্কে মন্তব্য করলে সে সম্পর্কে অন্য কে কি বলেছে, সেদিকে তাকানোর প্রশ্নই উঠে না'।[৫৮]

৫৩. *হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী, ফাৎহুল বারী শরহে ছহীহুল বুখারী (বৈরুতঃ দারুল কুতুবু আল-ইলমিয়াহ, ১৯৮৯খৃঃ/১৪১০হিঃ), ৪/৩১৯ পৃঃ, হা/২০১৩-এর আলোচনা দ্রঃ।*

৫৪. *ছহীহ ইবনে খুযায়মাহ ৩/৩৪১ পৃঃ; ছহীহ ইবনে হিব্বান ইহসান সহ হা/২৪০৭, ৬/১৬৯-৭০ পৃঃ; তাবরানী, আল-মু'জামুছ ছাগীর, পৃঃ ১০৮; ক্বিয়ামুল লাইল হা/১১৪, পৃঃ ৯০; হায়ছুমী, মাজমাউয যাওয়ায়েদ ৩/১৭৫ পৃঃ; মুসনাদে আবু ইয়ালা প্রভৃতি।*

৫৫. *শায়খ আল্লামা শামসুল হক আযীমাবাদী, আওনুল মা'বূদ শরহে আবুদাঊদ (বৈরুতঃ দারুল কুতুব আল-ইলমিয়াহ, তাবি), ৪/১৭৫ পৃঃ; হা/১৩৭২-এর আলোচনা দ্রঃ; কিয়ামুল লাইল হা/১১৪, পৃঃ ৯০।*

৫৬. *আল্লামা হাফেয যাহাবী, মীযানুল ই'তেদাল ফী নাক্বদির রিজাল (বৈরুতঃ দারুল মা'রেফাহ, তাবি), ৩/৩১১-১২ পৃঃ।*

৫৭. *ইবনু হাজার আসক্বালানী, শারহু নুখবাতুল ফিকার (সিলেটঃ মুহাম্মাদী কুতুব খানা, ১৯৯৮ খৃঃ), পৃঃ ১৬২।*

৫৮. *আবদুর রহমান মুবারকপুরী, তুহফাতুল আহওয়াযী বিশরহে জামে'উত তিরমিযী (বৈরুতঃ দারুল কুতুব আল-ইলমিয়াহ, ১৯৯০ খৃঃ/১৪১০ হিঃ), ৩/৪৪২ পৃঃ, হা/৮০৩-এর আলোচনা দ্রঃ।*

শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) বলেন, سنده حسن 'হাদীছটির সনদ হাসান'।[৫৯] ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) উক্ত হাদীছটি স্বীয় ফাৎহুলবারীতে দলীল হিসাবে উদ্ধৃত করে ছহীহ বা হাসান সাব্যস্ত করেছেন।[৬০]

উল্লেখ্য, রাসূল (ছাঃ) থেকে আরো কয়েকটি ছহীহ ও হাসান হাদীছ রয়েছে।

বলিষ্ঠ দলীলের আলোকে ছাহাবীদের যুগে এবং ওমর (রাঃ)-এর নির্দেশিত তারাবীহ্র ছালাত ৮ রাক'আতঃ

মুসলিম সমাজে প্রচার করা হয় যে, ছাহাবীদের যুগে বিশেষ করে ওমর ও আলী (রাঃ) উভয়েই বিশ (২০) রাক'আত তারাবীহ চালু করেছিলেন। এটা ডাহা মিথ্যা কথা। এ সমস্ত মর্যাদাশীল জান্নাতী ছাহাবীগণের প্রতি অপবাদ আরোপ করা মাত্র। কারণ তাঁরা কখনো রাসূল (ছাঃ)-এর অনুসরণের ক্ষেত্রে কোন রকমের ত্রুটি বা কম-বেশী করেননি। নিম্নে এ বিষয়ে আলোকপাত করা হ'লঃ

(١) عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ أَنَّهُ قَالَ أَمَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أُبَىَّ بْنَ كَعْبٍ وَ تَمِيْمًا الدَّارِىَّ أَنْ يَّقُوْمَا لِلنَّاسِ بِإِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً...

(১) সায়েব ইবনু ইয়াযীদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'ওমর (রাঃ) উবাই ইবনু কা'ব ও তামীম আদ-দারী (রাঃ)-কে লোকদের নিয়ে ১১ রাক'আত ছালাত আদায় করার নির্দেশ প্রদান করেন'...।

উপরোক্ত হাদীছটি সাতের অধিক হাদীছ গ্রন্থে বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। যার সবগুলিই ছহীহ।[৬১] আল্লামা নীমভী হানাফী (রহঃ) তাঁর 'আছারুস সুনান' গ্রন্থে হাদীছটির সনদ সম্পর্কে বলেন, إسناده صحيح 'এ হাদীছের সনদ ছহীহ'।[৬২] শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন, هذا إسناد صحيح جداً... فإن السائب بن يزيد صحابى حج مع النبى صلى الله عليه وسلم وهو صغير-

৫৯. *মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী, ছালাতুত তারাবীহ (বৈরুতঃ আল-মাকতাবুল ইসলামী, দ্বিতীয় প্রকাশঃ ১৯৮৫ খৃঃ/১৪০৫ হিঃ), পৃঃ ১৮।*

৬০. *ফাৎহুল বারী ৩/১৬ পৃঃ, হা/১১২৯-এর আলোচনা দ্রঃ।*

৬১. *মুওয়াত্ত্বা মালেক ১/১১৫ পৃঃ 'রামাযান মাসে রাত্রির ছালাত' অনুচ্ছেদ; ছহীহ ইবনে খুযায়মাহ ৪/১৮৬ পৃঃ; বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা হা/৪৬১৬, ২/৬৯৮ পৃঃ; সাঈদ ইবনু মানছূর, আস-সুনান; কিয়ামুল লাইল, পৃঃ ৯১; আবুবাকর আন-নীসাপূরী, আল-ফাওয়ায়েদ ১/১৩৫ পৃঃ; বায়হাক্বী আল-মা'রেফাহ; ফিরইয়াবী ১/৭৬ পৃঃ ও ২/৭৫ পৃঃ; আলবানী, তাহক্বীক্ব মিশকাত (বৈরুতঃ ১৯৮৫/১৪০৫), ১/৪০৭ পৃঃ, হা/১৩০২-এর টীকা সহ দ্রঃ; বঙ্গানুবাদ মেশকাত ৩য় খণ্ড, হা/১২২৮ 'রামাযানের রাতের ছালাত' অনুচ্ছেদ।*

৬২. *তুহফাতুল আহওয়াযী ৩/৪৪২ পৃঃ।*

'এ হাদীছের সনদ অতীব বিশুদ্ধ। ...কারণ সায়েব ইবনু ইয়াযীদ এমন ছাহাবী, তিনি অল্প বয়সে রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে হজ্জ করেছেন'।[৬৩] অন্যত্র তিনি উক্ত হাদীছ সম্পর্কে আলোচনার পর এর সনদে উল্লিখিত রাবী মুহাম্মাদ ইবনু ইউসুফ সম্পর্কে বলেন,

قلت وهذا سند صحيح جداً فإن محمد بن يوسف شيخ مالك ثقة اتفاقًا واحتج به الشيخان 'আমি বলছি, এ হাদীছের সূত্র অত্যন্ত ছহীহ। কেননা এর রাবী মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ ইমাম মালেক (রহঃ)-এর উস্তাদ। সকলের ঐক্যমতে তিনি একজন অত্যন্ত বিশ্বস্ত রাবী। ইমাম বুখারী ও মুসলিম তাঁর থেকে দলীল (হাদীছ) গ্রহণ করেছেন'।[৬৪]

আল্লামা ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী তাঁর মিশকাতুল মাছাবীহ-এর জগদ্বিখ্যাত ভাষ্য 'মির'আতুল মাফাতীহ' গ্রন্থে উক্ত হাদীছের ভাষ্যে পরিষ্কার বলে দিয়েছেন,

هذا نص فى أن الذى جمع عليه الناس عمر فى قيام رمضان وأمرهم بإقامته هو إحدى عشرة ركعة مع الوتر وإن الصحابة والتابعين على عهده كانو يصلون التراويح إحدى عشرة ركعة موافقا لما تقدم من حديث عائشة... وموافقا لما تقدم من حديث جابر-

'ওমর (রাঃ) রামাযানের রাত্রিতে ছালাতের জন্য লোকদেরকে যে একত্রিত করেছিলেন এবং তিনি যে তাদেরকে বিতর সহ ১১ রাক'আত করে পড়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন, নিশ্চয় এ হাদীছটিই তার প্রমাণ। এছাড়া সকল ছাহাবী এবং তাবেঈগণও যে তাঁর যুগে তারাবীহ্র ছালাত ১১ রাক'আতই পড়তেন তারও সুস্পষ্ট প্রমাণ। কারণ এ হাদীছটি পূর্বে বর্ণিত আয়েশা (রাঃ)-এর হাদীছের সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্যশীল এবং জাবের (রাঃ) বর্ণিত হাদীছের সাথেও সামঞ্জস্যশীল'।[৬৫]

(২) عن محمد بن يوسف أنَّ السَّائِبَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ جَمَعَ النَّاسَ عَلَى أُبَيٍّ وَ تَمِيْمٍ فَكَانَا يُصَلِّيَانِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً-

(২) মুহাম্মাদ ইবনু ইউসুফ (রাঃ) বলেন, সায়েব ইবনু ইয়াযীদ (রাঃ) তাকে এ মর্মে জানিয়েছেন যে, 'ওমর (রাঃ) উবাই এবং তামীম আদ-দারীর মাধ্যমে লোকদের একত্রিত করেন। অতঃপর তারা উভয়ে ১১ রাক'আত ছালাত আদায় করান'।[৬৬]

হাদীছটি সম্পর্কে আল্লামা ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী (রহঃ) বলেন, إسناده صحيح 'হাদীছটির সনদ ছহীহ'।[৬৭] উল্লেখ্য, এরূপ আরো কয়েকটি ছহীহ ও হাসান হাদীছ রয়েছে।

* তাদের মতে ১২৮৪ হিজরীর পূর্বে কেউই আট রাক'আতের প্রতি মতপোষণ করেননি। তাদের এই বক্তব্য যে চরম ধৃষ্টতাপূর্ণ তা তাদেরই প্রখ্যাত ওলামায়ে কেরামের বক্তব্য দ্বারা প্রমাণ করা যাক।

আমরা পূর্বে আল্লামা যায়লাঈ, বদরুদ্দীন আয়নী, ইবনুল হুমাম, আল্লামা নীমভী প্রমুখ প্রখ্যাত হানাফী বিদ্বানগণের মন্তব্য পেশ করেছি। নিম্নে আরো কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় পণ্ডিতের বক্তব্য উপস্থাপন করা হ'লঃ

(১) আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী হানাফী (১২৯২-১৩৫২ হিঃ) তাঁর ছহীহ বুখারীর ভাষ্যগ্রন্থ 'ফায়যুল বারী'-তে বলেন, إن التراويح لم يثبت مرفوعا أزيد من ثلاث عشرة ركعة إلا بطريق ضعيف 'নিশ্চয়ই তারাবীহ্র ছালাত ১৩ রাক'আতের অতিরিক্ত মরফূ' সূত্রে প্রমাণিত হয়নি; যঈফ সূত্রে ব্যতীত'। অর্থাৎ ১৩-এর অধিক রাক'আত সংক্রান্ত বর্ণনাগুলিকে তিনি যঈফ আখ্যায়িত করেছেন।[৬৮]

উল্লেখ্য যে, উক্ত ১৩ রাক'আতের ৮ রাক'আত তারাবীহ, ৩ রাক'আত বিতর এবং বাকী ২ রাক'আত ফজরের পূর্বের দুই রাক'আত সুন্নাত অথবা এ ছালাত শুরু করার পূর্বের সংক্ষিপ্ত দুই রাক'আত। বুখারী ও মুসলিমে এ দু'রকমই বর্ণনা এসেছে।[৬৯]

তিনি তাঁর তিরমিযী শরীফের ভাষ্যগ্রন্থ 'আল-আরফুশ শাযী'তে বলেন, وأما النبى صلى الله عليه وسلم فصح عنه ثمان ركعات وأما عشرون ركعة فهو عنه عليه السلام بسند ضعيف وعلى ضعفه اتفاق

৬৩. আলবানী, ইরওয়াউল গালীল (বৈরুতঃ আল-মাকতাবুল ইসলামী, ২য় প্রকাশঃ ১৯৮৫/১৪০৫হিঃ), ২/১৯২-৯৩পৃঃ, হা/৪৪৫-এর আলোচনা দ্রঃ এবং ছালাতুত তারাবীহ, পৃঃ ৪৬।

৬৪. ছালাতুত তারাবীহ, পৃঃ ৪৫

৬৫. শায়খ আল্লামা ওবায়দুল্লাহ রহমানী মুবারকপুরী, মির'আতুল মাফাতীহ শরহে মিশকাতুল মাছাবীহ (বেনারসঃ ইদারাতুল বুহূছ আল-ইসলামিয়াহ, ১৯৭৩ খৃঃ /১৩৯৪ হিঃ), ৪/৩২৯ পৃঃ, হা/১৩১০-এর আলোচনা দ্রঃ।

৬৬. ইবনু আবী শায়বাহ, আল-মুছান্নাফ (বৈরুতঃ ১৯৮৯/১৪০৯হিঃ), ২/২৮৪ পৃঃ, 'রামাযান মাসে ছালাত' অনুচ্ছেদ; আবদুর রাযযাক, আল-মুছান্নাফ (বৈরুতঃ ১৯৮৩/১৪০৩হিঃ), ৪/২৬০ পৃঃ, হা/৭৭২৭ 'রামাযান মাসে রাতের ছালাত' অনুচ্ছেদ।

৬৭. মির'আতুল মাফাতীহ ৪/৩৩৩ পৃঃ।

৬৮. আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী, ফায়যুল বারী আলা ছহীহিল বুখারী (দিল্লীঃ রাব্বানী বুক ডিপো, তাবি), ২/৪২০ পৃঃ।

৬৯. বুখারী হা/১১৪০ 'তাহাজ্জুদ' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৯; মুসলিম হা/১৮০৩-৪ 'মুসাফিরের ছালাত' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ -১৩৪।

'নবী করীম (ছাঃ) থেকে ছহীহ সূত্রে ৮ রাক'আতই প্রমাণিত হয়েছে। আর ২০ রাক'আতের সনদ যঈফ প্রমাণিত হয়েছে, এবং তার 'যঈফ' হওয়ার ব্যাপারে মুহাদ্দিছগণের ঐক্যমত রয়েছে'।[৭০] তিনি আরো স্পষ্ট করে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলেন, ولا مناص من تسليم أن تراويحه عليه السلام كانت ثمانية ركعات.

'আত্মসমার্পণ করা ছাড়া কোন উপায় নেই যে, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর তারাবীহ্র ছালাত ৮ রাক'আতই ছিল'।[৭১]

(২) 'হেদায়াহ'র ভাষ্যগ্রন্থ 'ফাৎহুল ক্বাদীর' প্রণেতা আল্লামা ইবনুল হুমাম হানাফী (মৃঃ ৬৮১ হিঃ) তারাবীহ্র রাক'আত সংখ্যার ব্যাপারে বিশদ আলোচনা শেষে বলেন,

فتحصل من هذا كله أن قيام رمضان سنة إحدى عشرة ركعة بالوتر فى جماعة فعله صلى الله عليه وسلم.

'উপরোক্ত সকল আলোচনার সার কথা এই যে, রামাযানের রাতের ছালাত জামা'আতের সাথে বিতরসহ ১১ রাক'আত পড়াই সুন্নাত, যা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আদায় করেছেন'।[৭২]

(৩) বুখারী শরীফের টীকাকার আহমাদ আলী সাহারাণপুরী হানাফীও উপরোক্ত মত ব্যক্ত করেছেন।[৭৩]

(৩) উপমহাদেশের খ্যাতনামা হানাফী মনীষী আবদুল হাই লাক্ষ্ণৌভী জাবির (রাঃ) বর্ণিত ৮ রাক'আতের হাদীছ উদ্ধৃত করার পর দ্বিধাহীনচিত্তে বলেন,

والحاصل أنه إن سئل من صلوة النبى صلى الله عليه وسلم فى تلك الليالى إنها كم كانت؟ فالجواب أنها ثمان ركعات لحديث جابر وإن سئل أنه هل صلى فى رمضان ولو أحيانا عشرين ركعة؟ فالجواب نعم ثبت ذالك بحديث ضعيف-

'মোদ্দা কথা হ'ল, যদি প্রশ্ন করা হয় রাসূল (ছাঃ) যে রাতগুলিতে তারাবীহ পড়েছিলেন তা কত রাক'আত ছিল? তাহ'লে জাবির (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীছের আলোকে উত্তর হবে ৮ রাক'আত পড়েছিলেন। আর যদি প্রশ্ন করা হয়, তিনি কি কখনো ২০ রাক'আত পড়েছেন? তাহ'লে উত্তর হবে, হাঁ এ মর্মে যঈফ হাদীছ রয়েছে'।[৭৪]

(৪) শায়খ আবদুল হক্ব মুহাদ্দিছ দেহলবী হানাফী (৯৫৮-১০৫২ হিঃ/১৫৫১-১৬৪২ খৃঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে বিশ রাক'আতের কোন ছহীহ হাদীছ নেই।

وأما عشرون ركعة فهو عنه عليه السلام بسند ضعيف وعلى ضعفه اتفاق-

'আর তাঁর পক্ষ হ'তে বিশ রাক'আতের যে বর্ণনা রয়েছে তার সনদ যঈফ এবং তার যঈফ হওয়ার ব্যাপারে সকল মুহাদ্দিছের ঐক্যমত রয়েছে'।[৭৫]

(৫) শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী (১১১৪-১১৭৬ হিঃ) 'মুওয়াত্ত্বা মালেক'-এর ভাষ্য 'আল-মুছাফ্ফা' গ্রন্থে দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করেন যে, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আমল দ্বারা তারাবীহ্র ছালাত বিতরসহ ১১ রাক'আতই প্রমাণিত'।[৭৬]

(৬) আল্লামা রশীদ আহমাদ গাংগুহী হানাফী (রহঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে তারাবীহ্র ছালাত বিতরসহ মাত্র ১১ রাক'আতই প্রমাণিত এবং তা সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ'।[৭৭]

চার ইমাম ও ছালাতুত তারাবীহ্র রাক'আত সংখ্যাঃ

(১) চার ইমামের মধ্য হ'তে ইমাম আবু হানীফা (৮০-১৫০হিঃ)-এর পক্ষ থেকে তাঁর অনুসারীরা বলে থাকেন যে, তারাবীহ বিশ রাক'আত। ইমাম আবু ইউসুফ এ সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করলে তিনি ওমর (রাঃ)-এর যুগের দিকে ইঙ্গিত করেন এবং ২০ রাক'আতের কথা বলেন মর্মে তারা একটি বক্তব্য উল্লেখ করে থাকেন। যদি তাঁর কথা ঠিক হয় তবুও তা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ ওমর (রাঃ)-এর যুগে বিশ রাক'আত সম্পর্কে যে কথা বলা হয়, তার যে কোন ছহীহ্ ভিত্তি নেই তা সুস্পষ্ট। সুতরাং দুর্বল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত কোন বক্তব্য কখনই গ্রহণযোগ্য হ'তে পারে না।

(২) ইমাম মালেক (৯৩-১৭৯হিঃ) সম্পর্কে ৩৬ রাক'আতের বর্ণনার কথা বলা হয়ে থাকে, কিন্তু তা সঠিক নয়। কারণ তাঁর নিজস্ব বক্তব্য দ্বারা ১১ রাক'আতের কথাই প্রমাণিত হয়। যেমন- মুহাদ্দিছ আবুল মানছূর আল-জুরী (মৃঃ ৪৬৯ হিঃ) ইমাম মালেক (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, عن مالك أنه قال الذى جمع عليه الناس عمر بن الخطاب أحب إلى وهو إحدى عشرة ركعة وهى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له إحدى عشرة ركعة بالوتر قال: نعم-

---

৭০. *আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী, আল-আরফুশ শাযী শরহে বি জামে' তিরমিযী (দেওবন্দঃ মুখতার এন্ড কোম্পানী, ১৯৮৫), ১/১৬৬ পৃঃ, 'রামাযান মাসে রাত্রির ছালাত' অনুচ্ছেদ, 'ছিয়াম' অধ্যায়।*

৭১. *প্রাগুক্ত, ১/১৬৬ পৃঃ।*

৭২. *ফাৎহুল ক্বাদীর ১/৪০৭ পৃঃ।*

৭৩. *ছহীহ বুখারী (মূল ভলিয়ম), ১/১৫৪ পৃঃ, টীকা নং-৩ দ্রঃ।*

৭৪. *আলবানী, নামাযে তারাবীহ (উর্দূ) অনুবাদঃ মুহাম্মাদ ছাদেক্ব খলীল (ফায়ছালাবাদঃ যিয়াউস সুন্নাহ, ১৪০৭ হিঃ), পৃঃ ৩৪-৩৫, টীকা-২, গৃহীতঃ তুহফাতুল আখবার, পৃঃ ২৮।*

৭৫. *ফাৎহু সিররিল মান্নান লি তাঈদে মাযহাবে নু'মান, পৃঃ ৩২৭।*

৭৬. *শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী, আল-মুছাফফা শরহে মালেক মুওয়াত্ত্বা (ফার্সী), পৃঃ ১৭৭।*

৭৭. *ঐ, রিসালাহ আল-হাক্কুশ শরীফ, পৃঃ ২২।*

'তিনি বলেন, ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) লোকদেরকে যার উপরে একত্রিত করেছিলেন আমার নিকট তাই সর্বোত্তম। আর ওমর (রাঃ) যা চালু করেছিলেন তা ছিল ১১ রাক'আত। আর এটাই ছিল রাসূল (ছাঃ)-এর ছালাত'। অতঃপর তাঁকে প্রশ্ন করা হ'ল, বিতরসহ ১১ রাক'আত? তিনি উত্তরে বলেন, হ্যাঁ'।

এরপর মুহাদ্দিছ আল-জুরী বিস্ময়ের সাথে বলেন, من أين أحدث هذا الركوع الكثير– 'আমি অবগত নই যে, কোথা থেকে (তাঁর-পক্ষে) এর অধিক রাক'আত সংখ্যা আবিষ্কৃত হ'ল?[৭৮] অন্যান্যরাও এরূপ মন্তব্য করেছেন।

এছাড়া তাঁর হাদীছের কিতাব 'মুওয়াত্ত্বা'তেও তিনি ওমর (রাঃ)-এর নির্দেশিত ১১ রাক'আতের বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন। যদিও তারপর ইয়াযীদ ইবনু রূমান থেকে ২০ রাক'আতের একটি 'মুনকার' ও ভিত্তিহীন বর্ণনাও তিনি নিয়ে এসেছেন। উল্লেখ্য যে, বলা হয়ে থাকে মদীনাতে ৪১ রাক'আত তারাবীহ চালু ছিল। এ কথাটিও সঠিক নয়। কারণ ইমাম মালেক (রহঃ)-এর জন্ম যেমন মদীনাতে, তেমনি তিনি সেখানেই শিক্ষা লাভ করেন এবং মসজিদে নববীতেই আজীবন হাদীছের দরস প্রদান করেন।[৭৯] তাই তাঁর মৃত্যু (১৭৯ হিঃ) পর্যন্ত মদীনাতে অতিরিক্ত রাক'আত সংখ্যা চালু হয়নি বলে ধরে নেওয়া যায়।

(৩) ইমাম শাফেঈ (১৫০-২০৪হিঃ) সম্পর্কে স্পষ্ট কোন বক্তব্য পাওয়া যায় না। ইমাম তিরমিযী (রহঃ) ওমর ও আলী (রাঃ) পক্ষ থেকে বর্ণিত ২০ রাক'আতের প্রতি সুফিয়ান ছাওরী, ইবনুল মুবারক ও ইমাম শাফেঈর যে সমর্থন তুলে ধরেছেন তা ত্রুটিপূর্ণ। কারণ তিনি উক্ত বক্তব্য روى (কথিত) শব্দ দ্বারা উদ্ধৃত করেছেন।[৮০] এমনকি ইমাম শাফেঈ (রহঃ)-এর উক্তিটুকুও روى শব্দ দ্বারা উল্লেখিত হয়েছে।[৮১] আর মুহাদ্দিছগণের নীতি হ'ল, কোন অপ্রামাণ্য, দুর্বল ও ভিত্তিহীন বক্তব্য উদ্ধৃত করলে তাঁরা "روى" (কথিত) শব্দ দ্বারা উল্লেখ করেন। যেমন ইমাম নববী (৬৩১-৬৭৬ হিঃ) বলেন,

قال العلماء المحققون من أهل الحديث وغيرهم إذا كان الحديث ضعيفا لايقال فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعل أوأمر أونهى أو حكم وما أشبه ذلك صيغ الجزم وكذا لايقال فيه روى أبو هريرة أو قال أو ذكر أو أخبرأوحدث أونقل أو أفتى وما أشبهه، وكذا لايقال ذلك فى التابعين ومن بعدهم فيما كان ضعيفا فلا يقال فى شيئ من ذلك بصيغة الجزم وإنما يقال فى هذا كله روى عنه أو نُقِل أو حُكِيَ عنه....

'বিশেষজ্ঞ মুহাদ্দিছ ওলামায়ে কেরাম এবং অন্যান্যগণ বলেন, যখন কোন হাদীছ যঈফ প্রমাণিত হবে তখন বর্ণনার ক্ষেত্রে- রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, করেছেন, নির্দেশ করেছেন, নিষেধ করেছেন, সিদ্ধান্ত দিয়েছেন এবং এরূপই অন্যান্য দৃঢ়তা বাচক কোন শব্দ প্রয়োগ করা যাবে না। অনুরূপ ছাহাবীগণের ক্ষেত্রেও যেমন- আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, উল্লেখ করেছেন, সংবাদ দিয়েছেন অথবা এরূপ অন্যান্য শব্দও বলা যাবে না। এমনকি তাবেঈ ও তাদের পরবর্তীগণের ব্যাপারেও এরূপ বলা যাবে না যদি তা দুর্বল প্রমাণিত হয়। বরং উপরোক্ত ক্ষেত্রসমূহে বলতে হবে 'তার থেকে কথিত বা বর্ণিত আছে', উদ্ধৃত হয়েছে বা বিবৃত হয়েছে'...।[৮২]

বুঝা গেল ইমাম তিরমিযী (রহঃ)-এর নিকটেও উক্ত বক্তব্য প্রত্যাখ্যানযোগ্য, তাই তিনিও অনুরূপ শব্দ দ্বারাই ইমামদের কথাগুলি উল্লেখ করেছেন।

(৪) ইমাম আহমাদ (১৬৪-২৪১হিঃ)-এর ব্যাপারেও কোন নির্দিষ্ট রাক'আত সংখ্যা পাওয়া যায় না, বরং বলা চলে যে, তিনি নির্দিষ্ট রাক'আত সংখ্যার বিরোধী ছিলেন। উল্লেখ্য যে, ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (৬৬১-৭২৮হিঃ) ২০ রাক'আতের পক্ষে মত পোষণ করেছেন বলে চ্যালেদাতাগণ উল্লেখ করেছেন। অথচ ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) তারাবীহ্‌র রাক'আত সংখ্যার ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মতভেদ পেশ করতে চেয়েছেন মাত্র। তিনি ২০, ৩৯ এবং ১৩ রাক'আতের মোট তিনটি মত উল্লেখ করেছেন এবং সবশেষে বলেছেন, والصواب أن ذلك جميعه حسن كما قد نص على ذلك الإمام أحمد رضى الله عنه وأنه لايتوقت فى قيام رمضان عدد– 'সঠিক কথা এই যে, উক্ত প্রত্যেকটি মতই ভাল, যেমন ইমাম আহমাদ (রহঃ) উক্ত বিষয়ে বর্ণনা করেছেন। তিনি ক্বিয়ামে রামাযান সম্পর্কে কোন রাক'আত সংখ্যা নির্দিষ্ট করেননি'।[৮৩] বুঝা গেল ইমাম আহমাদ ও ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) উভয়েই নির্দিষ্ট রাক'আত সংখ্যার বিরোধী। অতএব ইমামগণের দ্বারাও নির্দিষ্ট বিশ রাক'আত সাব্যস্ত হ'ল না।

---

৭৮. *ছালাতুত তারাবীহ, পৃঃ ৭৯।*

৭৯. *ডঃ মুহাম্মাদ কামেল হুসাইন, ইমাম মালেক ও মুওয়াত্ত্বা কিতাব, দ্রঃ মুওয়াত্ত্বা মালেক (বৈরুতঃ দারুল কুতুব আল-ইলমিয়াহ, তাবি), ভূমিকা।*

৮০. *জামে' তিরমিযী ১/১৬৬ পৃঃ।*

৮১. *আল-মুযানী, আল-মুখতাছার ১/১০৭ পৃঃ-এর বরাতে ছালাতুত তারাবীহ, পৃঃ ৫৫।*

৮২. *দেখুনঃ ইমাম নববী, আল-মাজমূ' ১/৬৩ পৃঃ; ছালাতুত তারাবীহ, পৃঃ ৫৫-৫৬।*

৮৩. *দেখুনঃ ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উ ফাতাওয়া ২৩/১১২-১৩ পৃঃ।*

চ্যালেঞ্জ দাতাদের প্রতারণার স্বরূপঃ

দলীয় গোঁড়ামী মানুষকে অন্ধ ও বধির করে ফেলে। উপমহাদেশের মাযহাবী আলেমগণের অনেকে উক্ত গোঁড়ামীতে আক্রান্ত হয়ে নিজেরা পথভ্রষ্ট হয়েছেন, অন্যদেরকে পথভ্রষ্ট করেছেন। যেমন- হাদীছের প্রধান ছয়টি গ্রন্থের কোথাও ২০ রাক'আতের কোন ছহীহ, যঈফ ও জাল হাদীছও নেই। অথচ আবুদাউদের উদ্ধৃতি পেশ করা হয়েছে। কারণ হ'ল, দেওবন্দ মাদরাসার প্রধান উস্তাদ 'শায়খুল হিন্দ' নামে খ্যাত মাওলানা মাহমূদুল হাসান (১২৩৮-১৩৩৮ হিঃ)-এর টীকা কৃত আবুদাঊদ শরীফের 'বিতর ছালাতে কুনূত' অনুচ্ছেদে রাবী 'হাসান' কর্তৃক বর্ণিত মূল হাদীছে রয়েছে يصلي لهم عشرين ليلة 'তিনি (ওবাই বিন কা'ব) তাদেরকে বিশ রাত্র ছালাত পড়ান'। যদিও হাদীছটির সনদ যঈফ।[৮৪] উক্ত হাদীছের টীকায় তিনি মিথ্যা যোগ করে লিখেছেন, অন্য বর্ণনায় عشرين ركعة 'বিশ রাক'আত' রয়েছে। এই বিকৃত শব্দেই দিল্লী 'মুজতবাঈ প্রেস' আবুদাঊদ ছাপায়। অতঃপর মাওলানা খায়রুল হাসান আবুদাঊদ শরীফের টীকা লিখতে গিয়ে عشرين ركعة 'বিশ রাক'আত' মিথ্যা কথাটুকু মূল হাদীছের মতনে যোগ করে দেন এবং হাদীছের মূল শব্দ عشرين ليلة 'বিশ রাত্রি'-কে টীকায় নামিয়ে দেন। যা দিল্লী মজীদী প্রেস থেকে ছাপানো হয়।[৮৫] এই সংস্করণটি ১৯৮৫ সালে দেওবন্দের 'আছাহ্হুল মাতাবে' প্রেস কর্তৃক ছাপা হয়, যা আজ পর্যন্ত সমগ্র ভারত উপমহাদেশে পড়ানো হচ্ছে।[৮৬] অথচ তার পূর্বে ১২৬৪ হিজরীতে দিল্লী মুহাম্মাদী প্রেস, ১২৭২ হিজরীতে দিল্লী কাদেরী প্রেস সহ[৮৭] মধ্যপ্রাচ্যে তথা মিসর, সিরিয়া, লেবানন, কুয়েত, সঊদী আরব প্রভৃতি রাষ্ট্রে প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত আবুদাঊদের কোন মূল বা ব্যাখ্যা গ্রন্থে ঐরূপ মিথ্যা শব্দ সংযোজিত হয়নি। মাযহাবী ব্যবসা যে উপমহাদেশেই সিংহভাগ চলে এটাই তার বাস্তব প্রমাণ।

সম্প্রতি তাঁদের বাংলাদেশী অনুসারীরা পত্র-পত্রিকায় ও লিফলেটে ছহীহ হাদীছের উদ্ধৃতি বাদ দিয়ে নিজেদের দলীয় ও মাযহাবী কিতাব সমূহের প্রয়োজনীয় অংশের রেফারেন্স সমূহ ভরে দিয়ে সাধারণ জনগণের মধ্যে ফ্রি বিতরণ করছেন ও আহলেহাদীছগণের বিরুদ্ধে ও বিশেষ করে গবেষণা মাসিক আত-তাহরীকের বিরুদ্ধে বিষোদগার করছেন। এটা যে বুমেরাং হয়ে তাদের দিকেই ফিরে যাচ্ছে এবং 'হক্ব' প্রকাশ হওয়ার কারণে তাদের মসজিদগুলি এখন ৮ রাক'আতের পরে অর্ধেকের বেশী খালি হয়ে যাচ্ছে, এটা দেখেই সম্ভবতঃ তারা বেশী ক্ষেপে গেছেন। আর লাখ লাখ টাকার চ্যালেঞ্জ লিখে সর্বত্র বিতরণ করছেন। ছহীহ হাদীছের সম্মুখে এসব চ্যালেঞ্জের কোন মূল্য নেই, জনগণ তা ইতিমধ্যেই বুঝে গেছে।

উপসংহারঃ

পরিশেষে আমরা সকলের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাতে চাই যে, এক আল্লাহ্র সৃষ্টি ও একই নবীর অনুসারী হিসাবে আসুন অভ্রান্ত এবং সর্বশেষ অহি-র বিধান পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছকে হাতে-দাঁতে আঁকড়ে ধরি। পক্ষান্তরে ধর্মের নামে মানব রচিত জাল, যঈফ, মুনকার, বর্ণনা; ছহীহ হাদীছ বিরোধী কোন বক্তব্য এবং ভালোর নামে কোন অলী, পীর, বযুর্গ, আলেম বা কোন ব্যক্তির রচিত বিদ'আতী আমল চিরতরে প্রত্যাখ্যান করি। আমরা আল্লাহ্র দেওয়া অতি স্বচ্ছ ও সুন্দর শরী'আতের ব্যাপারে কাউকে কোন চ্যালেঞ্জ দিতে চাই না, অধিকারও রাখি না। আমরা কেবল সেই শরী'আতের আলোকে সার্বিক জীবন পরিচালনা করতে চাই এবং জাল, যঈফ, মিথ্যা, ভিত্তিহীন কথা ও অন্য কারো তৈরী বিদ'আতী আমলের দিকে মানুষকে আহ্বান না জানিয়ে কেবলমাত্র সেই সর্বোৎকৃষ্ট শরী'আতের দিকে মানুষকে আহ্বান জানিয়ে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে পরকালে জান্নাতের এক কোণে ঠাঁই পেতে চাই। হে আল্লাহ! আমাদের এ বাসনা তুমি কবুল কর- আমীন!!

সংশোধনী

নভেম্বর '০৪ সংখ্যা ৩০ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত ২০ রাক'আতের উপর ইজমা হয়েছে এই কথার প্রথম আবিষ্কারক আল্লামা আয়নী (রহঃ) নন, বরং তাঁর পূর্বে ইবনু কুদামা (রহঃ) স্বীয় 'মুগনী' গ্রন্থে ইজমার কথা বলেছেন। তবে তিনি সরাসরি ইজমার দাবী করেননি, বরং পরোক্ষভাবে বলেছেন كالإجماع 'ইজমার ন্যায়' *(ঐ, ১/৮৩৫ পৃঃ)*। উল্লেখ্য, ছাহাবায়ে কেরামের পর কোন বিষয়ে ইজমা দাবীর সত্যতা নেই। যেমন, ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেন, مَنِ ادَّعَى الإِجْمَاعَ فَهُوَ كَاذِبٌ... 'যে ব্যক্তি (ছাহাবীগণের পরে) ইজমা-র দাবী করে, সে মিথ্যাবাদী...*(ই'লামুল মুওয়াক্কে'ঈন ২/১৭৫ পৃঃ, 'দলীল গ্রহণে পরবর্তীদের পদ্ধতি' অনুচ্ছেদ)*! -*(লেখক)*।

---

৮৪. আলবানী, যঈফ আবুদাঊদ হা/১৪২৯; ঐ, মিশকাত হা/১২৯৩ 'কুনূত' অনুচ্ছেদ।

৮৫. ইবনে আহমাদ সালাফী, আহলেহাদীসের প্রকৃত পরিচয় (কলিকাতাঃ সালাফী প্রকাশনী, ১নং মারকুইস লেন, ২য় সংস্করণঃ ১৯৯৭), পৃঃ ৬৬-৬৭।

৮৬. ঐ, ১/২০২ পৃঃ, 'ছালাত' অধ্যায়, 'বিতর ছালাতে কুনূত' অনুচ্ছেদ। অতএব শিক্ষক ও ছাত্রমণ্ডলী এবং সংশ্লিষ্টগণ এ ব্যাপারে সুদৃষ্টি রাখুন।

৮৭. আহলেহাদীসের প্রকৃত পরিচয়, পৃঃ ৬৭-৬৮।

গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান

একজন দায়িত্বশীল অফিস প্রধান

আব্দুল হালীমের স্ত্রী রাবেয়া একজন বিদুষী, পতিপরায়ণা এবং অন্যান্য সদগুণে গুণান্বিতা নারী। আব্দুল হালীমও একজন সচ্চরিত্রবান যুবক। সে যে অফিসে কাজ করে সে অফিসের অনন্য ব্যক্তি এবং অন্যান্য কর্মচারীরাও সদগুণ সম্পন্ন এবং মানবদরদীও। আব্দুল হালীম একজন কর্তব্যপরায়ণ কর্মচারী। কর্তব্যে তাকে কোন দিন অবহেলা করতে দেখা যায় না। এজন্য অফিস প্রধান তার প্রতি অতি প্রসন্ন।

আব্দুল হালীমের বিবাহিত জীবনের ছ'বছর পর তাদের ঘরে এক পুত্র সন্তান জন্মলাভ করে। ফলে তাদের নিরাশার জীবনে আশার সঞ্চার হয়। বস্তুতঃ নিরাশার স্থলে আশা এবং আশার স্থলে নিরাশা সৃষ্টি মহান আল্লাহ পাকেরই লীলাখেলা। মানুষ আল্লাহ প্রদত্ত সীমিত জ্ঞানে বহু কিছু সাধন করলেও একটি বিকলাঙ্গ বা প্রতিবন্ধী শিশুর জন্ম রোধ করার মত ক্ষমতা সে রাখে না। তাই মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব যেন ম্লান হয়ে যায় অন্যান্য কাজে অক্ষমতার ফলে। এ কারণে আমি মনে করি মানুষ নিতান্তই অসহায়। অর্পিত দায়িত্ব যথাযথ প্রতিপালন করতে না পারলে পরবর্তীতে ভয়াবহ শাস্তি নিশ্চিত।

সদা প্রফুল্ল এবং কাজে একনিষ্ঠ আব্দুল হালীমকে সন্তান লাভের পর আর তেমনটি দেখা যায় না। তার হাসিমুখে বিষাদের ছায়া বিরাজমান। সে যেন বড় রকমের কোন এক দুর্বিষহ যন্ত্রণায় ভুগছে। সে সত্যি সত্যি একটি যন্ত্রণার শিকার। আর তা হচ্ছে, তার সন্তানটি হার্টে একটি ছিদ্র নিয়ে জন্মেছে। ফলে সে স্বাভাবিকভাবে শ্বাস নিতে ফেলতে পারে না। ডাক্তার দেখানো হ'লে সন্তানের সেই অসুবিধা ধরা পড়ে। অসুবিধা দূর করতে হ'লে হার্ট অপারেশন ছাড়া বিকল্প ব্যবস্থা নেই। আর এ কাজে অন্ততঃ ৩/৪ লাখ টাকা প্রয়োজন। এ অপারেশন দেশেও হবে না। এতো টাকা আব্দুল হালীমের নেই এবং এতো টাকার সম্পদও নেই। তাই তার মুখমণ্ডল দুশ্চিন্তায় মলিন।

স্ত্রী রাবেয়া এ বাস্তবতা উপলব্ধি করতে পেরেছে যে, এতো টাকা সংগ্রহ করা তাদের সামর্থ্যের বাইরে। তাই চিকিৎসার অভাবে তাদের বহুদিনের প্রত্যাশিত ধনকে ধুকেধুকে তার চোখের সামনে মৃত্যুবরণ করতে হবে ভেবে সে নীরবে অশ্রু বিসর্জন করে।

আব্দুল হালীমের বোন জেসমিন নাহার ভাইয়ের বাসায় থেকে লেখাপড়া করে। ভাই-ই তাকে তার আশ্রয়ে রেখে লেখাপড়া করায়। উদ্দেশ্য, বোন উচ্চশিক্ষিতা হ'লে তাকে একজন ভাল পাত্রের হাতে তুলে দিতে পারবে। জেসমিন শিশুটির অবস্থা অহরহ প্রত্যক্ষ করছে। তাই সে একদিন ভাবীকে ডেকে বলল, 'ভাবী, আমি আর পড়াশুনা করব না। বাড়ী চলে যাব'। হঠাৎ করে ভাবী তার এরূপ সিদ্ধান্ত নেওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করলে সে বলে, 'আমি তোমাদের আর খরচ বাড়াতে চাই না। তোমরা আমার জন্য যে খরচ কর, তা বাঁচিয়ে শিশুটির চিকিৎসা করে তাকে সুস্থ করে তোল'।

ভাবী তাকে তার এ সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করতে বলে এবং বলে, 'তুমি এ সিদ্ধান্ত তোমার ভাইকে কখানো বলো না। তাহ'লে তিনি মনে দারুণ আঘাত পাবেন। আমরা নিশ্চিত ধরে নিয়েছি, আমরা তাকে সুস্থ করে তুলতে পারব না। তার মৃত্যু অবধারিত। কারণ চিকিৎসার অত টাকা আমরা কোথায় পাব'?

রাবেয়ার শাশুড়ীর নামে কিছু সম্পত্তি আছে। নাতির চিকিৎসার জন্য তিনি তা বেঁচে দিতে চান। কিন্তু আব্দুল হালীম তাতে সম্মত নয়। কারণ সে সম্পত্তির উৎপন্ন ফসলে মাতা-পিতার কোনমতে দিন কাটে। তাছাড়া সে সম্পত্তি বেঁচেও চিকিৎসার টাকা হবে না।

একদিন অফিসের প্রধান কর্মকর্তা আব্দুল হালীমকে তাঁর কক্ষে ডেকে নিয়ে তার এ পরিবর্তনের কারণ জিজ্ঞেস করেন। আব্দুল হালীম অনিচ্ছা সত্ত্বেও তার সন্তানের বিষয়টি তাঁকে অবহিত করেন। তার বস তাকে বলেন, 'আমরা সকলে মিলে তোমার সন্তানের জন্য অর্থ সাহায্য করব এবং প্রয়োজনে ভিক্ষা চাইব। একটি নিষ্পাপ শিশুকে বাঁচিয়ে তুলতে পারি কিনা চেষ্টা করে দেখব। আব্দুল হালীম এতে আপত্তি করে। সে বলে, 'আমার জন্য আপনি অন্যের কাছে হাত পাতবেন, এটা হ'তে পারে না। আমি আমার স্বার্থে আপনাকে এভাবে মানুষের কাছে ছোট হ'তে দিতে পারি না'।

প্রধান কর্মকর্তা বলেন, 'আমি যদি তোমার এ বিপদে আমার সামর্থ্য অনুযায়ী তোমার পাশে না দাঁড়াই, তাহ'লে এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ্‌র কাছে আমাকে জবাবদিহি করতে হবে। অতএব আমি তোমার কোন আপত্তি মানতে রাযী নই। একাজ আমার দায়িত্ব বলে মনে করি'।

একদিন বিকেলে অফিসের প্রধান কবীর ছাহেব আব্দুল হালীমের বাসায় এসে হাযির। আব্দুল হালীমের সন্তানকে দেখলেন। তিনি শিশুর ফটোর একটি নেগেটিভ কপি নিয়ে চলে গেলেন। তিনি বিভিন্ন পত্রিকায় শিশুটির ছবি ছাপিয়ে তার অসুখের বিবরণ দিয়ে তাকে বাঁচিয়ে তুলতে সাহায্যের হাত প্রসারিত করতে আবেদন জানালেন। এতে কাজ হ'ল।

আব্দুল হালীম শিশুর চিকিৎসার জন্য স্ত্রীসহ বিদেশ যাত্রা করতে বিমানবন্দরে উপস্থিত হ'লে, তাদের বিদায় জানাতে এসেছেন অফিসের প্রধান কবীর ছাহেব, সহকর্মী আবুল হাসান এবং অন্যান্য দাতা ব্যক্তিরা। সবাই আল্লাহ্‌র কাছে শিশুটির আরোগ্য কামনা করে তাদের বিদায় দিলেন।

** মুহাম্মাদ আতাউর রহমান*
সাং- সন্ন্যাসবাড়ী, পোঃ বান্দাইখাড়া, নওগাঁ।

চিকিৎসা জগৎ

দুর্ঘটনায় দাঁত হারালে করণীয়

প্রবাদ আছে, বিপদ কখনও বলে-কয়ে আসে না। অর্থাৎ দুর্ঘটনার কোন নির্দিষ্ট সময় নেই। হঠাৎ করেই আসে, মোটর সাইকেল, মোটর গাড়ী, সাইকেল, স্কুটার, বক্সিং, ফুটবল, ঘুষি, টিউবওয়েল দ্বারা হঠাৎ করেই আঘাতের ফলে দাঁতই যদি মাটিতে লুটায়, আপনি জানেন কি, দুর্ঘটনায় পড়ে যাওয়া দাঁতটি অথবা দাঁতগুলিকে অবশ্যই পুনঃস্থাপন করা সম্ভব। তবে পড়ে যাওয়া দাঁতটিকে যেনতেনভাবে রাখলেই চলবে না, দাঁতটিকে বিশেষভাবে সংরক্ষণ করতে হবে। কিন্তু আমাদের দেশের অনেকেই জানেন না, দাঁতটি যে চোয়ালে পুনঃস্থাপন সম্ভব এবং কিভাবে দাঁতটিকে সংরক্ষণ করতে হয়। এই জন্য জনগণের মধ্যে সতর্কতা ও কিছু বিশেষ জ্ঞান এবং কিভাবে দাঁতটিকে সংরক্ষণ করতে হয় তা জানা অতীব প্রয়োজন। চোয়াল থেকে দাঁত সম্পূর্ণ বেরিয়ে আসলে প্রথম কাজ হ'ল দাঁতটি বা দাঁতগুলিকে অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করা এবং ধুলা থেকে তুলে হালকাভাবে জীবাণুমুক্ত পানি দ্বারা ধোয়া। যাতে ধুলাবালি চলে যায়, তবে মনে রাখা উচিত দাঁতের টিস্যু যাতে চলে না যায়। এরপর মুখগহ্বরের নীচে অর্থাৎ লালার ভিতর রাখতে হবে দাঁতটি যেন শুকিয়ে না যায়। এছাড়া ঠাণ্ডা দুধের মধ্যে অথবা নরমাল স্যালাইনের মধ্যে অথবা ডাবের পানির মধ্যে রাখতে হবে। এগুলি না থাকলে সাধারণ পানিতে রাখলেও চলবে। এছাড়া দুর্ঘটনায় দাঁত পড়ার ২-৬ ঘন্টার মধ্যে ডাক্তারের কাছে যাওয়া উত্তম। এর ফলে দাঁতটি রুটক্যানেল করার প্রয়োজন হয় না; বরং সঠিক স্থানে দাঁতটি বসিয়ে দিলেই হবে, যদি কোনক্রমেই দু'তিন দিনের মধ্যে ডেন্টাল সার্জনের শরণাপন্ন হওয়া সম্ভব না হয়, তবে টেলিফোনে ডাক্তারের পরামর্শানুযায়ী নিজেই দাঁতটিকে ৬ ঘন্টার মধ্যে বসিয়ে দিতে হবে।

ছোটদের ক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় দাঁত হারালে দুধ দাঁত হলে দাঁতটি পুনঃস্থাপন করার তেমন প্রয়োজন নেই। তবে যদি দাঁতটি পড়ার অনেকদিন, আগে পড়ে যায় এবং বিশেষ কারণে সংরক্ষণ করার দরকার হয়, তবে অভিভাবকগণ দাঁতটি সংরক্ষণ করতে চাইলে করতে পারেন। এক্ষেত্রে মনে রাখা উচিত বাচ্চার দাঁত স্থায়ী দাঁত হ'লে অবশ্যই সংরক্ষণ করতে হবে। বাচ্চারা যেহেতু অবুঝ তাই তারা নিজেরা মুখের ভিতর দাঁতটি লালার মধ্যে রাখার সময় গিলে ফেলতে পারে। তাই মা-বাবা অথবা বাচ্চার অভিভাবকগণ বাচ্চার দুর্ঘটনায় পতিত দাঁতটি মুখে রাখতে পারেন। এছাড়া কাঁচা ঠাণ্ডা দুধ অথবা ডাবের পানি অথবা নরমাল স্যালাইনে দাঁতটি ডুবিয়ে রাখতে হবে এবং অতি সত্বর দাঁত নিয়ে বাচ্চাকে দন্ত বিশেষজ্ঞকে দেখাতে হবে। এছাড়া ইচ্ছা করলে সাবধানে দাঁতটিকে ধরে ভেজা রুমালে জড়িয়ে রাখা যেতে পারে। বাচ্চাকে সঙ্গে সঙ্গে টিটেনাস ইনজেকশনও দিতে হবে। ৬ ঘন্টার মধ্যে ডাক্তারের কাছে যাওয়া উত্তম। কিন্তু কোন বিশেষ কারণে দু'একদিনের মধ্যে ডাক্তারের শরণাপন্ন হওয়া সম্ভব না হ'লে অভিভাবক নিজেই ডাক্তারের পরামর্শানুযায়ী দাঁতটি মাড়ীর ভিতর বসিয়ে দিবেন এবং পার্শ্ববর্তী দাঁতের সাথে সিল্ক সুতা দিয়ে বেঁধে দেওয়া যেতে পারে এবং পরবর্তীতে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দন্তবিশেষজ্ঞের শরণাপন্ন হ'তে হবে। তবে ৬ ঘন্টার অনেক পরে আসলে অনেক ক্ষেত্রে সমস্ত দাঁতের শেষ অংশটুকু কেটে ফেলে দিতে হবে, দাঁতের মজ্জা পরিষ্কার করে ঐ অংশটুকু পূরক পদার্থ দ্বারা ভরাট করে দিতে হবে এবং ঐ অবস্থায় দাঁতটিকে চোয়ালের মধ্যে পুনঃস্থাপন করা সম্ভব। সাধারণতঃ তিন সপ্তাহের মধ্যে দাঁতটি জোড়া লেগে যায় এবং দাঁতটি পুনরায় কার্যক্ষম হয়। এছাড়া দাঁত দু'টোকে রুট ক্যানেল চিকিৎসা করে স্প্রিন্টিং করে দেওয়া হয়। ৬ সপ্তাহ পর তার স্প্রিন্টিং খুলে দেওয়া হয়।

সুতরাং যে কোন কারণেই দুর্ঘটনায় দাঁত পড়ে গেলে ঘাবড়াবার কিছু নেই, বিব্রত বা মনোঃকষ্ট না নিয়ে অতিসত্বর দন্ত বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন, যদি দুর্ঘটনায় বসিয়ে দেওয়া দাঁতটি মৃত্যু পর্যন্ত স্থায়ী দাঁতের মতো থাকে তবে অবাক হবার কোন কারণ নেই। তবে তিন মাস পরপর এক্সরে করে দেখতে হবে দাঁতের গোড়ায় কোন ইনফেকশন হচ্ছে কি-না।

ডাঃ শাহিদা ইউসুফ সাখি
ডেন্টাল অনুষদ
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, (পিজি হাসপাতা), ঢাকা।

"আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল সূদকে করেছেন হারাম"

শিকদার এন্টারপ্রাইজ

● ত্রিপল ● তাঁবু ● ক্যানভাস ● পলিফেব্রিক্স
● রেইন কোর্ট ● গামবুট ● লাইফজ্যাকেট
ইত্যাদি প্রস্তুতকারক ও সরবরাহকারী।

ফোনঃ ৭১১৯০০৯,৭১১১২৯৯, ফ্যাক্সঃ ৯৫৫৯৩৬২, মোবাইলঃ ০১১৮৩৬২৪১

১ নং চন্ডিচরণ বোস ষ্ট্রীট
(মাওয়া বাস ষ্ট্যান্ডের পাশ্বে)
ওয়ারী, ঢাকা-১২০৩।

বি আর টি সি মার্কেট
দোকান নং- ২
ফুলবাড়ীয়া, ঢাকা- ১০০০।

ক্ষেত-খামার

খেজুরের পুষ্টিগুণ

প্রকৃতির এক অনন্য দান খেজুর। যা স্বাস্থ্যসম্মত ও পুষ্টিতে ভরপুর। খেজুর খেতে যেমন সুস্বাদু তেমনি পুষ্টিকর। উত্তর আফ্রিকার অনেক অঞ্চল, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, ইরান, সঊদী আরব, পাকিস্তান ও ভারতে খেজুর গাছ স্থানীয় উদ্ভিদ। দক্ষিণ ইরাক, মদীনার কাছাকাছি মরুদ্যানে ও উর্বরজমি এবং দক্ষিণ আরবের উপকূলীয় অঞ্চলে খেজুর উৎপন্ন হয়। ইরাক, সঊদী আরব, ইরান, উন্নতমানের খেজুরের জন্য বিখ্যাত। পৃথিবীর বৃহত্তম খেজুর উৎপাদনকারী এলাকা হ'ল দক্ষিণ ইরাক। যুক্তরাষ্ট্রেও ভাল খেজুর উৎপন্ন হয় বলে জানা যায়। পৃথিবীর উষ্ণ ও শুষ্ক অঞ্চলে এ ফলটি উৎপন্ন হয়। খেজুর গাছ আমাদের দেশেও প্রায় সব জায়গায়ই দেখা যায়। ভারতবর্ষ দেশী খেজুরের আদি নিবাস। বাংলাদেশের যশোর ও উত্তরবঙ্গে খেজুর গাছ বেশী জন্মে। খেজুরে বিভিন্ন ধরনের ভিটামিন রয়েছে। এসব ভিটামিন নানা ভাবে শরীরের স্বাভাবিক গঠন ও স্বাস্থ্য ভাল রাখতে সহযোগিতা করে। খেজুরের ঔষধিগুণ হৃদরোগ ও ক্যান্সারের ঝুঁকি কমায়। খেজুর আমাদের দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় স্বাস্থ্যসম্মত আদর্শ খাবার হিসাবে পরিগণিত হ'তে পারে। খেজুর মধুর শীতল, স্নিগ্ধ, রুচি, ক্ষয় ও রক্তপিত্ত রোগনিবারক, বল বাড়ায় ও শুক্র বৃদ্ধি করে।

খেজুরের মত খেজুরের রসও পুষ্টিকর পানীয়। শীত মৌসুমে গাছের উপরিভাগে কাণ্ডের একটু অংশ চেছে সংগ্রহ করা হয় সুস্বাদু রস। এটি অত্যন্ত সুপেয় রস। প্রচুর ভিটামিন ও শতকরা ১৪ ভাগ শর্করা এতে পাওয়া যায়। টাটকা কাঁচা রস যেমন খাওয়া যায়, আবার রস জ্বাল দিয়ে ঘন করে তৈরী করা যায় উপাদেয় খেজুরের গুড়। আয়ুর্বেদীয় মতে, খেজুরের রস হজমশক্তি বৃদ্ধি করে, শুক্র ও মূত্র বাড়ায়, বাত ও শ্লেষ্মা কমায়। আরব ও পশ্চিম এশিয়ায় খেজুর প্রাচীনকাল থেকেই সমাদৃত। আরব দেশে ভাল খেজুর পাওয়া যায়। আরব বেদুইনরাও একসময় শুধুমাত্র খেজুর খেয়ে জীবন ধারণ করতো। সেখানকার খেজুর বেশ রসালো ও মিষ্টি। রাসূল (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবীগণ ঈদের দিনে মিষ্টি, হালুয়া ও টাটকা খেজুর খেতেন। ঈদের দিনে মিষ্টি খাওয়া এবং অপরকে খাওয়ানো রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাত। ঈদের দিনে আমরা খোরমা খেয়ে থাকি। খোরমাও খেজুর। কিন্তু এটি শুকনো। অনেকে বাড়ীতে খোরমা সরু করে কেটে দুধের মধ্যে জ্বাল দেন। এটাও খুব সুস্বাদু খাবার। পবিত্র কুরআনেও খেজুর ফল থেকে খাবার তৈরী করাকে উৎসাহিত করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে একটি আয়াত তুলে ধরছি 'খেজুর বৃক্ষ ও আঙুর ফল থেকে তোমরা মধ্যম ও উত্তম খাদ্য তৈরী করে থাক, এতে অবশ্যই বোধশক্তিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে' *(নাহল ৬৭)*।

খেজুর বিভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে। এগুলির রং আকার আকৃতি যেমন বিভিন্ন হয় তেমনি এর স্বাদও ভিন্ন রকম। উন্নত মানের কয়েকটি খেজুরের নাম যেমন- সুখখাল, শাকবী, বরণী, জারী জালী কাল কাহ, আজওয়া ইত্যাদি। এগুলির মধ্যে আজওয়া সবচেয়ে উন্নত।

॥ সংকলিত ॥

গাজরের পুষ্টিগুণ

হাতের নাগালে পাওয়া যায় গুণসমৃদ্ধ সবজি এই গাজর। গাজরে রয়েছে প্রচুর ভিটামিন 'এ'। গাজর নিয়মিত খেলে দৃষ্টিশক্তি ভাল থাকে, অন্ধত্ব ও রাতকানা রোগ প্রতিরোধ করে। এটি মস্তিষ্ক ও হৃৎপিণ্ডকে শক্তিশালী করে এবং দন্ড ও অস্থি গঠনে অবদান রাখে। এটি হার্টষ্ট্রোকে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা ৫০% হ্রাস করে। এক গবেষণায় দেখা গেছে যে, সপ্তাহে পাঁচ দিন মধ্যম আকারের একটি করে গাজর খেলে মহিলাদের হার্ট ষ্ট্রোকের সম্ভাবনা হ্রাস করে এবং পুরুষদের ১০% কোলেস্টেরল হ্রাস করে। গাজরের লুটিন জাতীয় এ্যান্টি অক্সিডেন্ট আছে। এটি ক্যান্সার প্রতিরোধ করে। নিয়মিত গাজর খেলে ফুসফুসে ক্যান্সারের সম্ভাবনা ৫০% হ্রাস করে এবং বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে চোখের রোগ প্রতিরোধ করে। মানবদেহের অত্যাবশ্যকীয় এসিড 'এ্যামাইন' রয়েছে গাজরে। গাজর প্রতিদিন খেলে ত্বকের রং উজ্জ্বল করে। এটা গ্যাষ্ট্রিক আলসারের জন্য বেশ উপকারী।

গাজরে রয়েছে সুস্থ স্বাস্থ্য গঠনে নিম্নবর্ণিত পুষ্টি উপাদান। জলীয় অংশ ৮৫.০ গ্রাম, আমিষ ১.২ গ্রাম, শর্করা ১২.৭ গ্রাম, ক্যালসিয়াম ২৭.০ মিলিগ্রাম, আয়রণ ২.২ মিলিগ্রাম, ক্যারোটিন (ভিটামিন বি-১) ১০৫২০ মাইক্রোগ্রাম, ভিটামিন সি ১৫ মিলিগ্রাম, মোট খনিজ পদার্থ ০.৯ গ্রাম ও খাদ্যশক্তি ৫৭ কিলোক্যালরি।

লেবুর পুষ্টিগুণ

লেবুর পুষ্টিমান সম্পর্কে অনেকেরই জানা আছে। তবে পুরোপুরি গুণের কথা হয়ত সবার জানা নেই। এ সময় বাজারে হরেক রকম লেবু পাওয়া যায়। পাতি লেবু, কমলা লেবু, মোসম্বি লেবু, গন্ধরাজ ও বাতাবি লেবু। ১০০ গ্রাম কাগজি বা পাতি লেবু থেকে যে সমস্ত পুষ্টি উপাদান পাওয়া যায়, তা হচ্ছেঃ ভিটামিন সি ৬৩ মিঃ গ্রাম, যা আপেলের ৩২ গুণ ও আঙ্গুরের দ্বিগুণ। ক্যালসিয়াম ৯০ মিঃ গ্রাম, ভিটামিন এ ১৫ মাইক্রোগ্রাম, ভিটামিন বি ০.১৫ মিঃ গ্রাম, ফসফরাস ২০ মিঃ গ্রাম, লৌহ ০.৩ মিঃ গ্রাম। টাটকা লেবুর খোসাতেও পুষ্টি রয়েছে। প্রচণ্ড গরমে ১ গ্লাস ঠাণ্ডা লেবুর শরবত দেহের জন্য অত্যন্ত উপকারী এবং স্বস্তি ফিরিয়ে আনে।

লেবু ভিটামিন সি সমৃদ্ধ ফল। এই ভিটামিন দেহে সঞ্চিত অবস্থায় থাকে না, সেজন্য শিশু-বৃদ্ধ সকলকে প্রতিদিন ভিটামিন সি জাতীয় খাবার খাওয়া দরকার। জ্বর, সর্দি, কাশি ও ঠাণ্ডাজনিত সমস্যায় লেবু অত্যন্ত কার্যকর। লেবুতে থাকা প্রচুর ভিটামিন সি রোগ প্রতিরোধে সাহায্য করে ও স্কার্ভি রোগ থেকে রক্ষা করে। ভিটামিন সি দেহের ক্ষত নিরাময়ে সহায়তা করে এবং রক্তের জমাট বাঁধার ক্ষমতা বাড়ায়। লেবুতে পর্যাপ্ত ভিটামিন সি আছে, যা অ্যান্টি-অক্সিডেন্টাস হিসাবে কাজ করে দেহকে ক্যান্সার সহ নানা ঘাত-প্রতিঘাতের হাত থেকে রক্ষা করে। শিশুদের দৈনিক ২০ মিঃ গ্রাম ভিটামিন সি আবশ্যক। এ সময় ভিটামিন সি-এর অভাব হ'লে তা শিশুর উপর প্রভাব পড়ে। ফলে শিশুর দাঁত, মাড়ি ও পেশী মযবুত হয় না। মাথায় খুশকি নিবারণে লেবুর রয়েছে অসাধারণ ক্ষমতা। লেবুর রস চুলের গোড়ায় ঘসে ঘসে লাগিয়ে ১৫/২০ মিনিট পর পানিতে ধুয়ে নিতে হবে। এভাবে সপ্তাহে ২ দিন করে লাগালে মাথার খুশকি হবে সাফ এবং চুলের আঠালো ভাব দূর হয়ে চুল হবে উজ্জ্বল মসৃণ।

কবিতা

প্রভু, দাও নাজাত

-মুহাম্মাদ সিরাজুদ্দীন
আনছার হাট ইসঃ দাঃ মাদরাসা
শৌলমারী, জলঢাকা, নীলফামারী।

যালেমের যুলুম থেকে প্রভু
দাও মোদের নাজাত,
কৃপা করে প্রভু ওগো
কর হেদায়াত।
নিঃস্ব বান্দায় তোমায়
ডাকি চিরদিন,
দাও হে প্রভু ডাকে সাড়া
হৃদয় হয়েছে লীন।
তোমার এ নিখীল ধরায়
হতভাগা মোরা,
তোমার সকাশে কাঁদি ফিরিগো
দাও মোদের ডাকে সাড়া।
যালেমের যুলুম প্রভু
কত সইব আর,
চারিদিকে হত্যা-সন্ত্রাস
আমরা নির্বিকার।
তাই প্রভু দাও মোদের নাজাত
যালেমের যুলুম হ'তে,
চালাও প্রভু মোদের তুমি
নাজাতের পথে॥

***

হাওয়ার পাখি

-মুহাম্মাদ শাহজাহান আলী
মহেশ্বরপাশা বাজার
বি,আই,টি দৌলতপুর, খুলনা।

তুলতুলে এক হাওয়ার পাখি
বুকের খাঁচায় বাসা,
সে বোঝে সব জীবন-মরণ
সুখ স্বপ্ন আশা।
কত দিন বইবে বাতাস
সেই পাখিটা জানে,
চাওয়া-পাওয়া ভোগ, বিলাস
অট্টালিকার মানে।
সে পাখিটা অতি ভবদীয়
সব শেষে বড় পর,
মেললে ডানা শুন্য খাঁচা
পরিত্যক্ত ঘর।
সে পাখিটা বড়ই স্বাধীন
রাখে না কারও কথা,
সময় হ'লে যাবেই যাবে
যে পাক যত ব্যথা।
সেই পাখিটার খালেক যিনি
বাধ্য অতি তাঁর,
হুকুম হ'লেই সয়না দেরি
মাটির দেহ পর!

হেরার আলো

-আতাউর রহমান মণ্ডল
মুংলী, চারঘাট, রাজশাহী।

আঁধারের বোরকাতে ছিল যে ঢাকা আরব জাহান
এ বোরকা ছিঁড়ে আধাঁর কোথাও যাবে নাকি হয়ে চালান?
ঐখানে আধাঁর ছিল আলোক এল
আলোকে সব স্বস্তি পেল
বস্তীবাসী স্বস্তি পেয়ে
সুখে করে দিন গুযরান।
মরুচারী জাত বেদুঈন
আলো পেয়ে বুঝলো একীন,
মদ-নারীতে উড়িয়েছে
বৃথা কত বিত্ত-সামান।
গারে হেরার তাজাললিতে
বুদ্‌দু গোঁয়ার সাড়া দিতে
ছাড়লো আবাস সইলো যুলুম
'আহাদ' নামের গায় তবু গান।
করতে আল্লাহকে খুশী-রাযী
রাখল সবাই জীবন বাজী
লোহুর সায়র দেয় পাড়ী দেয়
বদর-ওহুদ-তাবুক প্রমাণ।
ইসলামে আজ আসছে আঘাত
নেই কেন নেই তার প্রতিঘাত?
আল্লাহ্‌র কালাম-নবীর হাদীছ
আঁকড়িয়ে ধরে হও আগুয়ান।

***

ডেন্টাল ক্লিনিক (ঝড় কোম্পানী)

সর্বাধুনিক বিদেশী যন্ত্রপাতি সুসজ্জিত মুখ ও দন্ত রোগ চিকিৎসা কেন্দ্র

ডাঃ মোঃ আবুবকর ছিদ্দিক
বি.এম এন্ড ডি.সি, আর.ডি.এস (ঢাকা)

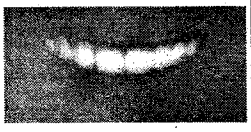

চেম্বার ঃ
২১, বনানী মার্কেট, সাতক্ষীরা।
(রক্সী সিনেমা হলের নীচে)
মোবাইল ঃ ০১৭১ ৯৬০৮৮১
ফোন ঃ (০৪৭১) ৬৩৭১৭

এখানে অত্যাধুনিক বিদেশী যন্ত্রপাতির সাহায্যে ব্যাথাযুক্ত দাঁত মর্জা পরিবর্তন করে স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করা, আকা-বাঁকা ও উঁচু-নিচু দাঁত সোজা করা, দাঁত ফিলিং, R.C.T. W/Cap, মাড়ি থেকে রক্ত পড়া বন্ধ করার জন্য আল্ট্রাসোনিক স্কেলিং করা, বিনা যন্ত্রনায় দাঁত তোলা, পোকা খাওয়া দাঁত, সামনে বা মাড়ির দাঁত কালার দাঁত ম্যাচিং ফিলিং করা, কালার ম্যাচ করে সুন্দর রূপে কৃত্রিম দাঁত বাঁধানোসহ সর্বপ্রকার দন্তরোগের সাধারণ চিকিৎসা করা হয়।

রোগী দেখার সময় ঃ সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১টা এবং বিকাল ৪টা থেকে রাত ৮টা।

বিঃদ্রঃ দাঁত তোলার জন্য ওয়ান টাইম ডিসপোজেবল নিডিল ব্যবহার করা হয়।

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (শহর পরিচিতি)-এর সঠিক উত্তর

১। বেলগ্রেড। ২। রাজস্থান ৩। শিকাগো।
৪। নিউইয়র্ক। ৫। জেনেভা।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (স্বদেশ)

১। বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় পর্বত কোনটি?
২। বাংলাদেশের সবচেয়ে উঁচুতে অবস্থিত গ্রামের নাম কি?
৩। এদেশের সব উঁচুতে অবস্থিত জনবসতি কোনটি?
৪। বাংলাদেশের সবচেয়ে উঁচুতে অবস্থিত লেক কোনটি?
৫। বাংলাদেশের সীমান্ত যেলা কতটি? এই সীমান্ত যেলাগুলির মধ্যে ভারতের কতগুলি ছিটমহল আছে?

❒ মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান
কেন্দ্রীয় পরিচালক, সোনামণি।

চলতি সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (শহর পরিচিতি)

১। কোন শহরকে 'নিষিদ্ধ নগরী' বলে?
২। কোন নগরীকে 'ট্যাক্সির নগরী' বলে?
৩। কোন নগরীকে 'স্বর্ণ নগরী' বলে?
৪। কোন নগরীকে 'চির বসন্তের নগরী' বলে?
৫। কোন নগরীকে 'দ্বীপের নগরী' বলে?

❒ ইমামুদ্দীন
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

সোনামণি সংবাদ

প্রশিক্ষণঃ

আন্ধারিয়াপাড়া, ফুলবাড়ীয়া, ময়মনসিংহ, ৮ নভেম্বর, সোমবারঃ অদ্য সকাল ১০-টায় আন্ধারিয়াপাড়া বাজার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সোনামণি হাফেয মুহাম্মাদ আলীর কুরআন তেলাওয়াত ও শাহ্ আলমের জাগরণী পরিবেশনের মাধ্যমে সোনামণি প্রক্ষিণ শুরু হয়। হাফেয আবুল কালামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণে উদ্বোধনী ভাষণ পেশ করেন অত্র যেলার সোনামণি পরিচালক মাওলানা মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমান।

উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলইয়াস। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন নওদাপাড়া মাদরাসা শাখার সোনামণি সহ-পরিচালক হুমায়ুন কবীর।

এছাড়া প্রশিক্ষণে উপস্থিত ছিলেন মাষ্টার সাইফুল ইসলাম, ওমর ফারূক, আব্দুস সালাম, আব্দুছ ছামাদ ও আব্দুস সাত্তার সরকার প্রমুখ। প্রশিক্ষণ শেষে সোনামণি শাখা গঠন করা হয়।

একই দিন বাদ আছর চকরাধাকানাই ফুরক্বানীয়া মাদরাসায় সোনামণি মুহাম্মাদ রাসেলের কুরআন তেলাওয়াত ও কবীর হোসাইনের জাগরণী পরিবেশনের মাধ্যমে সোনামণি প্রশিক্ষণ শুরু হয়।

অত্র যেলার সোনামণি পরিচালক মুহাম্মাদ লুৎফর রহমানের সার্বিক সহযোগিতায় ও মাষ্টার শাহাবুদ্দীন-এর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলইয়াস। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন নওদাপাড়া মাদরাসা শাখার সোনামণি সহ-পরিচালক হুমায়ুন কবীর।

উত্তর নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী, ১ ডিসেম্বর, বৃহস্পতিবারঃ অদ্য সকাল ৬-টায় উত্তর নওদাপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে মামূনুর রশীদের কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ শুরু হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক ইমামুদ্দীন। অত্র মসজিদের ইমাম আবু নো'মান-এর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণে স্বাগত ভাষণ পেশ করেন নওদাপাড়া মাদরাসার শিক্ষক জনাব মাওলানা আফযাল হোসাইন। সমাপনী ভাষণ প্রদান করেন রাজশাহী মসজিদ মিশন একাডেমীর শিক্ষক জনাব গোলাম রব্বানী। পরিশেষে প্রধান প্রশিক্ষক সকলের পরামর্শক্রমে সেখানে সোনামণি শাখা গঠন করেন।

শাখা গঠনঃ

❑ আন্ধারিয়াপাড়া বাজার (বালক) শাখা, ময়মনসিংহঃ

পরিচালনা পরিষদঃ
প্রধান উপদেষ্টাঃ আব্দুস সালাম (এইচ,এস,সি)
উপদেষ্টা ঃ হাফেয আবুল কালাম
পরিচালকঃ ওমর ফারূক (এইচ,এস,সি)
সহ-পরিচালক ঃ মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম (বি,এ)
সহ-পরিচালক ঃ আলমগীর হোসাইন (বি,এ)।

কর্মপরিষদঃ
১. সাধারণ সম্পাদক ঃ আবু রায়হান (৫ম শ্রেণী)
২. সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ শাহ্ আলম (৬ষ্ঠ শ্রেণী)
৩. প্রচার সম্পাদক ঃ আহমাদ আলী
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক ঃ আকরাম হোসাইন
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদকঃ রুমেল (হেফয বিভাগ)।

❑ আন্ধারিয়াপাড়া বাজার (বালিকা) শাখা,ময়মনসিংহঃ

পরিচালনা পরিষদঃ
প্রধান উপদেষ্টাঃ আব্দুস সালাম (এইচ,এস,সি)
উপদেষ্টা ঃ হাফেয আবুল কালাম
পরিচালকঃ ওমর ফারূক (এইচ,এস,সি)
সহ-পরিচালক ঃ মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম (বি,এ)
সহ-পরিচালক ঃ আলমগীর হোসাইন (বি,এ)।

কর্মপরিষদঃ
১. সাধারণ সম্পাদিকা ঃ লিযা আখতার (৭ম শ্রেণী)
২. সাংগঠনিক সম্পাদিকা ঃ রুনা আখতার (৮ম শ্রেণী)
৩. প্রচার সম্পাদিকা ঃ আফরোজা আখতার (")
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদিকাঃ মৌসুমী (৫ম শ্রেণী)
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদিকাঃ শান্তা আখতার (")।

স্বদেশ-বিদেশ

স্বদেশ

চলনবিলের হাওড় অঞ্চলে মুক্তাচাষের উজ্জ্বল সম্ভাবনা

বৃহত্তর চলনবিল অঞ্চলে মুক্তাচাষের উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে। অথচ সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে উদ্যোগ ও সুষ্ঠু বাজারজাতকরণের অভাবে প্রতিবছর কোটি কোটি টাকার মুক্তা আহরণ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে দেশ। চলনবিলের হাওড় অঞ্চলে বিল, পুকুর, ডোবাসহ শত শত জলাশয়ে প্রাকৃতিক নিয়মে ঝিনুকের জন্ম হয়ে থাকে। চলনবিলের চাটমোহর, ভাঙ্গুড়া, ফরিদপুর, তাড়াশ, উল্লাপাড়া, বড়াইগ্রাম, সিংড়া ও গুরুদাসপুর উপযেলার হাওড় অঞ্চলের ঝিনুক থেকে শ্বেতী, চুমকি, প্যারাচুর, মতিপোল, মুক্তা ও চন্দ্রিকা আহরণ করা হয়। এছাড়া সাদা, গোধূলী, ধূসরসহ বিভিন্ন রঙের মুক্তা এসব ঝিনুক থেকে পাওয়া যায়। এখানে প্রায় ৮/১০ হাযার ঝিনুক আহরিত হয়। এ কাজে অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে-মেয়ে সহ হাযার হাযার লোক জড়িত। শুধু অজ্ঞতার কারণে ৯০ ভাগ মুক্তা সংগ্রহ সম্ভব হচ্ছে না। আড়ানী থেকে বর্তমানে চলনবিলের বিভিন্ন হাওড় এলাকায় বছরে ন্যূনতম এক কোটি টাকার মুক্তা আহরিত হয়। গবেষণা ও মুক্তা আহরণের উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করা হ'লে চলনবিল অঞ্চলে ৯০ ভাগ মুক্তা সংগ্রহ করা সম্ভব। দেশে মুক্তা বাজারজাতকরণের কোন সুব্যবস্থা না থাকায় সংগ্রহকারীদের প্রায় ১৫ শতাংশ মুক্তা একশ্রেণীর সাধারণ ব্যবসায়ী বিশেষ করে স্বর্ণকারদের দোকানে পানির দামে বিক্রি করতে হচ্ছে। জানা যায়, চলনবিল অঞ্চলের মুক্তার মান ও গুণ ভাল হওয়ায় বিদেশে এর চাহিদা রয়েছে। অলংকারের সৌন্দর্য বৃদ্ধির পাশাপাশি মুক্তা দিয়ে জীবন রক্ষাকারী ওষুধ তৈরী করা হয়। আন্তরিক উদ্যোগ, সুষ্ঠু মুক্তা সংরক্ষণ, আহরণ ও বাজারজাতকরণের অভাবে চলনবিলের হাওড়াঞ্চলে মুক্তা চাষের উজ্জ্বল সম্ভাবনা ব্যাহত হচ্ছে।

[আল্লাহ সর্বত্র তার বান্দার জন্য রূযী ছড়িয়ে রেখেছেন। বান্দার দায়িত্ব হ'ল সেগুলো বৈধভাবে সংগ্রহ ও ভোগ করা। সরকারের দায়িত্ব হ'ল তার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার নীতি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা, যাতে লুটপাট ও বিনষ্ট না হয়। সরকার কি এদিকে দৃষ্টি দেবেন? (স.স)]

জাহাযমারা-নিঝুম দ্বীপ ক্রসবাঁধ নির্মিত হ'লে জেগে উঠবে কয়েক লাখ একর জমি

নোয়াখালী যেলার মূল ভূখণ্ড থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন এবং মেঘনাবেষ্টিত হাতিয়া উপযেলার জাহাযমারা হ'তে নিঝুম দ্বীপ পর্যন্ত ক্রসবাঁধ নির্মিত হ'লে এর বহুমুখী সুফল পাওয়া যাবে। ক্রসবাঁধ নির্মাণের পর চার বছরের মধ্যে এখানে আট থেকে দশ লাখ একর ভূমি জেগে উঠবে। যার ভৌগলিক আয়তন হবে কয়েকটি উপযেলার আয়তনের সমান। পরবর্তী পাঁচ বছরে কমপক্ষে আরো ১০/১২ লাখ একর ভূমি জেগে ওঠার উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে বলে বিশেষজ্ঞদের অভিমত। অর্থাৎ ক্রসবাঁধ নির্মিত হবার মাত্র ৮/৯ বছরের মধ্যেই কয়েকটি যেলার আয়তনের সমান ভূমি জেগে উঠবে।

ক্রসবাঁধ নির্মাণের সুফল হিসাবে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর নিঝুম দ্বীপ দেশের অন্যতম পর্যটন কেন্দ্র হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। এখানকার লাখ লাখ অধিবাসীর জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে। এছাড়া দক্ষিণের সমুদ্রে একটি স্থায়ী নৌ-বন্দর স্থাপন, মৎস্য চাষ, মৎস্য প্রজনন কেন্দ্র, মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা স্থাপন, অর্থনীতির সাথে সম্পৃক্ত আরো অনেক শিল্প কারখানা স্থাপিত হবে। এখানকার উৎপাদিত খাদ্যশস্য দিয়ে চট্টগ্রাম বিভাগের খাদ্য চাহিদা মেটানো সম্ভব হবার পাশাপাশি উক্ত অঞ্চল দেশের অর্থনৈতিক জোনে প্রবেশ করবে। অন্যদিকে বন বিভাগের উদ্যোগে এখানে সবুজ বেষ্টনী গড়ে উঠবে। যা থেকে অর্জিত বিশাল রাজস্ব দেশের জাতীয় বাজেটকে আরো শক্তিশালী করবে।

জানা গেছে, ভূমি পুনরুদ্ধার বিভাগসহ বিভিন্ন বিদেশী সংস্থা ক্রসবাঁধ নির্মাণের সম্ভাব্যতা যাচাইকল্পে বেশ কয়েকবার এখানে জরিপ কাজ সম্পন্ন করে। এর মধ্যে কয়েকটি সংস্থা ক্রসবাঁধ নির্মাণের পক্ষে তাদের মতামত ব্যক্ত করে। অথচ মাত্র ৩০/৩৫ কোটি টাকা ব্যয়ে কয়েক হাযার কোটি টাকার ভূমি জেগে ওঠার সম্ভাবনাটিতে এ যাবৎ কোন সরকারই গুরুত্ব দেয়নি।

[দলাদলির রাজনীতিতে মূল টার্গেট থাকে বিরোধী দলকে দমন ও নিজের দলের লালন। এর পরে অন্য কিছু। অতএব মূল রোগের ঔষধ না দিলে স্রেফ সদিচ্ছায় কোন কাজ হবে না। তবুও সরকারকে বলব, একটু নযর দিন (স.স)]

টমেটো ভয়ঙ্কর!

সকাল হ'লেই ধুম পড়ে টমেটো তোলার। টমেটো তুলে জমির পাশেই স্তূপ করে রেখে শুরু হয় রাসায়নিক ওষুধ মেশানো। ১ ঘন্টা পর চলে টমেটো শুকানোর কাজ। শুকানো হ'লে চাল করার জন্য ভরা হয় ঝুড়িতে। রাজশাহীর বসন্তপুর, গোপালপুর, কুসুন্দা, হাবাসপুর, ভাউসপুর, কানাইডাঙ্গাসহ আরো কয়েকটি এলাকায় গেলেই যেকোন ব্যক্তির চোখে পড়বে রাসায়নিক ওষুধ মেশানোর দৃশ্য। কৃত্রিম উপায়ে ফলন বাড়াতে এবং দ্রুত বড় ও লাল টুকটুকে করতে কয়েক বছর ধরে টমেটোতে ব্যবহৃত হচ্ছে মারাত্মক রাসায়নিক দ্রব্য।

পত্রিকায় প্রকাশ, টমেটোর দ্রুত পচন ঠেকাতে বহুদিন ধরে ডাইথেন-এম-৪৫, টিল্ট ও কাঙ্গিসাইট, ডার্বিসাইট, লোকাল-১০, কিষাণ-২৫ সহ আরো কয়েক ধরনের ভারতীয় কীটনাশক ব্যবহার করা হচ্ছে। এতে টমেটো পাকার পরও দু'সপ্তাহ পর্যন্ত রাখা যায়। সাথে সাথে এর রংও ভাল থাকে, নষ্ট হয় না। তাছাড়া আরো ইথিনাল জাতীয় ইডেন, টমটম, রাইপেন ও প্রফিট নামের চারটি ওষুধ ব্যবহার করা হচ্ছে।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিজ্ঞানী ও কৃষিতত্ত্ব বিশেষজ্ঞ ডঃ গোলাম কবীর বলেন, গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, এ সমস্ত কেমিক্যাল মানবদেহের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। তাছাড়া রাসায়নিক দ্রব্য দিয়ে প্রক্রিয়াজাতকরণে ফল বা সবজিতে কোন পুষ্টি থাকতে পারে না। এসব পদার্থের ক্ষতিকর উপাদান মানুষের পাকস্থলীতে যায়। ফলে এক পর্যায়ে গুরুতর অসুখে

আক্রান্ত হওয়ার আশংকা সৃষ্টি হয়। অনুরূপ মত ব্যক্ত করেছেন, 'রাবি'র প্রাণরসায়ন ও অনুজীব বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক আর,কে, সাহা, কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের উদ্ভিদ তত্ত্ববিদ ডঃ ইত্তেফাকুল ইসলাম প্রমুখ।

[সামান্যতম ঈমান ও আল্লাহভীতি থাকলেও মানুষ এভাবে ঠাণ্ডা মাথায় নিজ হাতে বিষ মাখিয়ে অন্যকে তা খাওয়াতে পারে না। অর্থলোভ মানুষকে এমনি করেই অন্ধ করে ফেলে। হে মানুষ! আল্লাহকে ভয় কর। তুমি তাকে লুকিয়ে কিছুই করতে পারবে না। যে হাত দিয়ে বিষ মাখাচ্ছো, ঐ হাত ক্বিয়ামতের দিন তোমার বিরুদ্ধে স্বাক্ষ্য দেবে। অতএব তওবা কর (স.স)]

হালকা প্রকৌশল শিল্পপণ্যঃ রফতানী খাতের নতুন সম্ভাবনা

উন্নত দেশ বা সমৃদ্ধ দেশ বলতে শিল্প ও প্রযুক্তিতে উন্নত দেশ বুঝায়। পৃথিবীর যেসব দেশ ইতিমধ্যে অর্থনৈতিকভাবে প্রাচুর্য লাভ করেছে, সেসব দেশ শিল্পায়নের উচ্চ প্রযুক্তির শিখরে অবস্থান করছে। পৃথিবীর যেসব দেশ উন্নত অথবা অত্যন্ত উন্নত তালিকার শীর্ষে রয়েছে, সেসব দেশের প্রতিটিই প্রথমে হালকা প্রকৌশল শিল্পে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিল। আমাদের কাছাকাছি দেশগুলির মধ্যে থাইল্যাণ্ড, মালয়েশিয়া, চীন, হংকং, দক্ষিণ কোরিয়া ও জাপান প্রথমত হালকা প্রকৌশল শিল্পে সাফল্য অর্জন করে বর্তমানে শিল্প সমৃদ্ধ দেশ হিসাবে পরিগণিত হয়েছে।

বাংলাদেশ এখনো শিল্প প্রধান দেশের কাছাকাছি সূচকে পৌঁছতে পারেনি। তবে আশার কথা শিল্প সমৃদ্ধ দেশের গৌরব অর্জনের পূর্বলক্ষণ হালকা প্রকৌশল শিল্পে-বাংলাদেশ ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে। এর কারণ এদেশে হাল্কা প্রকৌশল শিল্পের সম্ভাবনা প্রচুর। এ শিল্পের প্রসার নীরবে এগিয়ে চলেছে।

দেশের প্রকৌশল শিল্পপণ্যের রফতানী বাজার এখনো উল্লেখযোগ্য স্থানে পৌঁছতে পারেনি। বেসরকারী উদ্যোগে কয়েকটি পণ্যের সীমিত রফতানী হচ্ছে। এসব পণ্যের মধ্যে রয়েছে সাইকেল, ব্যাটারী, ইউপিএস, বেসক্যাপ, কাগজকলের যন্ত্রাংশ, ভোল্টেজ স্টাবিলাইজার, ব্যাটারী চার্জার, ফেন্সি লাইট ফিটিংস, জিপার প্রভৃতি। গার্মেন্টস শিল্পে ব্যবহৃত বয়লার মেশিন, ওয়াশিং প্ল্যান্ট, সেনিটারী ফিটিংস, মেরিণ ইঞ্জিন যন্ত্রাংশ, সী ট্রলার যন্ত্রাংশ ইত্যাদি এখন রফতানী হচ্ছে। পেপার ও সিমেন্ট মিলের কিছু যন্ত্রাংশ বর্তমানে কানাডা, কুয়েত, মালয়েশিয়া ও ফিলিপাইনে এজেন্ট সাব কনট্রাকটিংয়ের মাধ্যমে রফতানী হচ্ছে।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় হালকা প্রকৌশল শিল্পের প্রসার ও রফতানী বৃদ্ধির জন্য প্রকৌশল শিল্প সম্পর্কিত 'ব্যবসা উন্নয়ন পরিষদ' গঠন করেছে। এখাতের পণ্য রফতানীর ওপর এর ইতিবাচক প্রভাব পড়তে শুরু করেছে।

এছাড়া এখাতে সরকারের বিভিন্ন সহায়ক কর্মসূচী গ্রহণের ফলে দিন দিন রফতানীর পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০০২-২০০৩ অর্থ বছরের তুলনায় ২০০৩-২০০৪ অর্থ বছরে এখানে রফতানী বৃদ্ধির হার ২২৪ দশমিক ৩২ শতাংশ। ২০০২-২০০৩ অর্থ বছরে প্রকৌশল দ্রব্যাদি রফতানী করে দেশ ১২ দশমিক ৯১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ২০০১-২০০২ অর্থ বছরে ১ দশমিক ৩৭ মিলিয়ন ডলার আয় করে।

[আমরা দেশের যেকোন বৈধ শিল্পের উন্নয়নকে স্বাগত জানাই এবং বেসরকারী হাল্কা প্রকৌশল শিল্পে বিনা সূদে ঋণ সহায়তা প্রদানের আবেদন জানাই (স.স)]

বিশ্বব্যাংক যাদের বন্ধু তাদের আর শত্রুর প্রয়োজন হয় না

বাংলাদেশে বিশ্বব্যাংকের দায়মুক্তি প্রদানের লক্ষ্যে জাতীয় সংসদে আনা বিলের প্রতিবাদে গত ২৬ নভেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি সড়কদ্বীপে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক, রাজনীতিবিদ ও আইনজীবীগণ বলেছেন, বিশ্বব্যাংক যাদের বন্ধু হয়, তাদের আর শত্রুর প্রয়োজন হয় না। বিশ্বব্যাংকই তাদের ধ্বংসের জন্য যথেষ্ট। বাংলাদেশের পাট খাত ধ্বংস করে বিশ্বব্যাংক এটা প্রমাণ করেছে।

বিশ্বব্যাংকের দায়মুক্তি প্রসঙ্গে বক্তাগণ বলেন, পৃথিবীর কোন দেশেই বিশ্বব্যাংককে দায়মুক্তি দেয়া হয়নি। বিশ্বব্যাংকের বাংলাদেশ কান্ট্রি ডিরেক্টর ক্রিষ্টিনা রোকা ৩৮ দেশে বিশ্বব্যাংককে দায়মুক্তি দেয়া হয়েছে বলে যে দাবি করেছেন তা সঠিক নয়। বিশ্বব্যাংকের দায়মুক্তি পাওয়ার কোন অধিকার নেই। কারণ আইন-কানুন ও নিয়ম অনুযায়ী প্রত্যেককেই তার কৃতকর্মের দায় বহন করতে হবে। তিনি বলেন, বিশ্বব্যাংককে দায়মুক্তি না দিলেও তারা বাংলাদেশের কিছু করতে পারবে না। এমনকি ঋণ সাহায্যও বন্ধ করতে পারবে না। কারণ সমগ্র বিশ্বই এ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। সাংবাদিক সোহরাব হাসান বলেন, গত ২৫ বছর ধরে বিশ্বব্যাংক তাদের স্বেচ্ছাচারী নীতি চালিয়ে আসছে, যার জন্য এখন তারা দায়মুক্তি চাচ্ছে।

[বিশ্বব্যাংক, আই,এম,এফ প্রভৃতি আন্তর্জাতিক অর্থলগ্নিকারী সূদী প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের দেওয়া অমানবিক শর্তাবলী ও সূদের চক্রজালে ঋণগ্রহিতা দুর্বল দেশগুলিকে জোঁকের মত শোষণ করে চলেছে। এদের পিছনে রয়েছে আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির হিংস্র থাবা। অতএব সরকারকে বলব, এদের খপপর থেকে বেরিয়ে আসুন ও দেশে স্বাধীন ইসলামী অর্থনীতি বাস্তবায়ন করুন (স.স)]

ছয় তলা ও তদূর্ধ্ব ভবনে ছয় মাসের মধ্যে সাবষ্টেশন না বসালে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হবে

রাজধানী ঢাকার ছয় তলা ও তদূর্ধ্ব ভবনে আগামী ৬ মাসের মধ্যে বিদ্যুতের সাবষ্টেশন বসাতে হবে। ভবন মালিকরা নিজ খরচে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সাবষ্টেশন বসাতে ব্যর্থ হ'লে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হবে। অনুমোদিত লোডের অধিক বিদ্যুৎ ব্যবহার এবং ওভারলোডেড হয়ে যখন-তখন ট্রান্সফরমার বিকল হওয়া রোধ করতে বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয় এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। গত ২৪ নভেম্বর বিদ্যুৎ উপদেষ্টা কাউন্সিলের সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

উপদেষ্টা কাউন্সিলের বৈঠকে আরো সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে যে, এখন থেকে গ্রাহকরা বিদ্যুতের মিটার বাজার থেকে কিনতে পারবে না। বিদ্যুৎ বিতরণকারী সংস্থাগুলি মিটার বিক্রি করবে। আমদানীকারকরা সব মিটার জমা দেবেন বিদ্যুৎ বিতরণকারী সরকারী সংস্থায়। এসব মিটার পরীক্ষা করে নির্ধারিত মূল্যে

গ্রাহকদের কাছে বিক্রি করবে। নতুন সব মিটার হবে প্রি-পেইড সিস্টেমের।

ডেসা জানিয়েছে, বিদ্যমান বিদ্যুৎ আইনে কোন বাড়ী বা ভবনে ৪৮ কিলোওয়াট ভোল্টেজের (কেভি) বেশী বিদ্যুৎ ব্যবহৃত হ'লে সেখানে নিজস্ব ট্রান্সফরমার বসাতে হবে। উল্লেখ্য, ঢাকার বেশীরভাগ ছয়তলা ভবনে ১০০ কেভির অধিক বিদ্যুৎ ব্যবহৃত হয়। ১০০ কেভি ক্ষমতার সাবষ্টেশন বসাতে ৪ থেকে ৫ লাখ টাকা ব্যয় হয়।

[যেকোন শুভ উদ্যোগ বানচাল করে ভিতরকার লোকেরা। অতএব ডেসা-র ভিতরকার রাঘব বোয়ালগুলোকে সামাল দিন। জনগণ ঠিকই আইন মানবে (স.স)]

তিনশ' টাকায় সন্তান বিক্রি!

স্বামীর মৃত্যুর পাঁচ দিনের মাথায় এক অভাবগ্রস্ত মা তার কোলের এক মাসের শিশু সন্তানকে ৩০০ টাকায় বিক্রি করে দিয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে গত ২৩ নভেম্বর সাতক্ষীরা জর্জ কোর্ট চত্বরে। হতভাগ্য কন্যা সন্তানটির নাম পারভিন আখতার।

অভাবগ্রস্ত মা সালমা খাতুন (৩২) জানান, তাদের বাড়ী সাতক্ষীরার আশাশুনি উপযেলার বেউলা গ্রামে। সংসারের অভাব-অনটন আর ঋণের বোঝা মাথায় নিয়ে গত ১৯ নভেম্বর তার স্বামী আব্দুর রাযযাক মারা যায়। স্বামীর অকাল মৃত্যুতে তিনটি কন্যা সন্তান নিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েন তিনি। পিত্রালয়ে বসবাস করলেও তাকে দেখার কেউ ছিল না। এক মাস বয়সের ফুটফুটে কন্যা পারভিনের দুধ কেনা থেকে শুরু করে সংসারের যাবতীয় খরচ চালাতে হিমশিম খেতে হয় তাকে। বাধ্য হয়ে তিনি সিদ্ধান্ত নেন কোলের মেয়ে পারভিনকে বিক্রি করে দেয়ার।

[এ খবর পড়ার পরে কোন মানুষ স্থির থাকতে পারে কি? পরবর্তী খবরে আমরা জানতে পেরেছি যে, মাননীয়া প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ নির্দেশ মোতাবেক উক্ত সন্তান তার মায়ের কোলে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং সাতক্ষীরা যেলা প্রশাসক জনাব ইলিয়াস উক্ত মহিলাকে নগদ ১০০০/= টাকা, ২টি শাড়ী, ২টি কম্বল এবং ভিজিএফ কার্ডের মাধ্যমে মাসিক ৩০ কেজি চাউল দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। আগামী দু'বছর যাবৎ উক্ত মহিলা এ সুবিধা পাবেন। এতদ্ব্যতীত মাথা গোঁজার ঠাঁই হিসাবে আবাসন প্রকল্পে তাকে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে'। আমরা এখবর জেনে স্বস্তি প্রকাশ করছি এবং মাননীয়া প্রধানমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। কিন্তু প্রশ্ন হ'লঃ এভাবে কি সর্বত্র নিঃস্ব মানবতার পুনর্বাসন সম্ভব? অতএব চাই এমন এক অর্থনৈতিক বিধিমালার অনুসরণ, যার মাধ্যমে ধনী ও গরীবের মধ্যকার পাহাড় প্রমাণ বৈষম্য বিদূরিত হয়ে সর্বত্র সামাজিক সাম্য ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হয় (স.স)]

বৃদ্ধ পিতা সন্ত্রাসী পুত্রকে পুলিশে ধরিয়ে দিলেন

পুলিশের তালিকায় চৌমুহনীর শীর্ষ সন্ত্রাসী জা'ফর আহমাদ (৩৪) কে পুলিশের হাতে তুলে দেন তার বৃদ্ধ পিতা হাজী আব্দুস সুবহান। সন্ত্রাসী পুত্রের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে নিজেই বাদী হয়ে বেগমগঞ্জ থানায় মামলা দায়ের করেন। জানা যায়, গত ২৬ সেপ্টেম্বর চৌমুহনীস্থ নোলাবাড়ী থেকে 'র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটেলিয়ন' (র‍্যাব-৭) তাকে গ্রেফতার করে। কয়েকদিন জেলে থেকে যামিন পায়। অনেকের মতে, 'র‍্যাবে'র কারণে আয়-রোযগার কমে যাওয়াতে সে পরিবারের উপর চাঁদার জন্য হামলা করে। গত ২৩ নভেম্বর সন্ধ্যায় নোলাবাড়ীয়ায় গিয়ে পিতা-মাতার নিকট বিপুল অংকের টাকা দাবী করে। টাকা দিতে অস্বীকার করলে সে ঘরের আসবাবপত্র ভাঙচুর করতে থাকে। এক পর্যায়ে কামড়িয়ে বড় ভাইয়ের শরীরের গোশত তুলে নেয়। ছোট ভাইকে মারধর করে এবং সবাইকে হত্যার হুমকি দেয়। ফলে পুলিশকে খবর দিলে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। সে নোয়াখালী যেলা বাস-মিনিবাস শ্রমিক ইউনিয়নের সম্পাদক। নিজেকে যেলা বিএনপির নেতা বলে দাবী করে।

[এঘটনা প্রমাণ করে যে, সন্ত্রাসী দমনের সাথে সাথে তাদের নৈতিক প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। নইলে ওরা আরো হন্যে হয়ে উঠবে ও জানমালের ক্ষতি করবে (স.স)]

ভূমি মামলায় বছরে ৭২ হাযার কোটি টাকা নষ্ট হয়

রিয়েল এস্টেট এণ্ড হাউজিং এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (রিহ্যাব) 'রিহ্যাব ডাইরেক্টরী' প্রকাশ করেছে। তথ্যমন্ত্রী এম, শামসুল ইসলাম রাজধানীর একটি হোটেলে গত ৫ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় উক্ত ডাইরেক্টরীর মোড়ক উন্মোচন করেন। মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তথ্যমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ একটি ভূমি অভাবী (ল্যাণ্ড হাংরী) দেশ। ভূমিস্বল্পতার চেয়ে ভূমিবন্টন ব্যবস্থা বড় সমস্যা। একটি বইয়ের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেন, ভূমিজনিত মামলা-মোকদ্দমায় বছরে ৭২ হাযার কোটি টাকা নষ্ট হয়।

[এ জন্য দায়ী এদেশের ভুল সরকারী ভূমিনীতি। 'আমীন' নামধারী এক ধরনের ভূমি জরিপকারী ও দুর্নীতিবাজ তহসিলদারগণ ঘুষখোর ম্যাজিষ্ট্রেটদের যোগসাজশে গরীব হকদারগণকে বঞ্চিত করে সর্বদা টাউট-বাটপার অর্থশালীদের পক্ষে কাজ করে যাচ্ছে। বঞ্চিতেরা তাদের শেষ আশ্রয়স্থল হিসাবে আদালতকে বেছে নেয়। যদিও তারা জানে যে, সেখানেও তারা সুবিচার পাবে না। তবুও এটাই শেষ ভরসা। অতএব জনগণের সরকার দ্রুত সিদ্ধান্ত নিন। নইলে বঞ্চিত জনগণ একটি বিস্ফোরণে পরিণত হবে (স.স)]

আদমজীকে ইপিজেড-এ রূপান্তরের সিদ্ধান্ত

সাভারের পর ঢাকায় আরো একটি ইপিজেড (এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোন) চালু হ'তে যাচ্ছে। বন্ধকৃত আদমজী জুট মিলই হবে এই নতুন ইপিজেড বা রফতানী প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল। গত ১লা ডিসেম্বর অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রীসভা কমিটিতে বন্ধকৃত আদমজী জুট মিলকে ইপিজেডে রূপান্তরিত করার এবং আদমজীর যাবতীয় স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি ২০০৫ সালের ৩১ মার্চের মধ্যে বাংলাদেশ এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোন অথরিটি (বেপজা) বা রফতানী প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, আদমজী জুট মিল বন্ধের পর সেখানে টেক্সটাইল ইণ্ডাষ্ট্রি ও গার্মেন্টিস শিল্পপল্লী গড়ে তোলার এবং সেখানে কয়েকশ' শিল্প প্লট তৈরী করে তা দেশীয় শিল্পোদ্যোক্তাদের মাঝে বিক্রির সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এজন্য আদমজী জুট মিলের সমুদয় জমি শিল্পমন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থার (বিসিক) কাছে হস্তান্তর করা হয়। কিন্তু আদমজী জুট মিলের মেশিনপত্র এতো বিশাল ও ভারী যে, বন্ধ ঘোষণার গত আড়াই বছরে এই মেশিনারিজের শতকরা ৩০ ভাগও এখান থেকে অন্যান্য রাষ্ট্রীয় জুট মিলে সরিয়ে নেওয়া সম্ভব হয়নি এবং আগামী ৫ বছরেও এই জুট মিলের জায়গা খালি করা সম্ভব হবে না বলে জানা গেছে।

[শিল্প মন্ত্রণালয়ের লোকেরা এসি রুমে বসেই সম্ভবতঃ এতদিন আদমজী দেখেছিলেন। এখন বাস্তবে গিয়ে দেখলেন যে, মেশিনগুলো ভারী। তাই ইপিজেডে রূপান্তরিত করার সিদ্ধান্ত। আমরা বলব, আদমজীকে জুটমিল হিসাবেই পুনরায় চালু করুন এবং এর লোকসানের কারণ গুলো দূর করুন। প্রধান কারণ সিবিএ বা 'ট্রেড ইউনিয়ন' অবশ্যই নিষিদ্ধ করুন। কর্মকর্তা-কর্মচারী সবাইকে কর্মমুখী করুন। তাহ'লে আদমজী তার হারানো ঐতিহ্য ফিরে পাবে ইনশাআল্লাহ (স.স)]

বিদেশ

ভূপালে কীটনাশক কারখানাঃ ২০ বছরে মারা গেছে ১৫ হাযার, আক্রান্ত ৮ লাখ

মধ্য ভারতের ভূপালে অবস্থিত একটি পরিত্যক্ত কীটনাশক কারখানা এখনো পরিবেশের বিরুদ্ধে মারাত্মক হুমকি। কারখানাটি ভূগর্ভস্থ পানিকে বিষাক্ত করছে। গত ২০ বছর আগে এই কারখানা থেকে গ্যাস নির্গত হয়ে কয়েক হাযার লোকের মৃত্যু ঘটে। স্থানীয় এক পরিবেশকর্মী জানান, কারখানার চারপাশে এখনো টন টন বিষাক্ত বর্জ্য পদার্থ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে।

গ্রীনপিস কমিশনের একটি সমীক্ষায় দেখা যায়, কারখানাটি কার্যকর থাকাকালীন ব্যবহৃত রাসায়নিক পদার্থের হিসাবের ভিত্তিতে এই পরিসংখ্যানটি প্রস্তুত করা হয়। ভারত সরকারের হিসাব অনুযায়ী ১৯৮৪ সালের ৩ ডিসেম্বর সকালে কারখানাটি থেকে বিষাক্ত গ্যাস মিথাইল আইসোসায়ানেট-এর নির্গমন শুরু হবার পর সাড়ে তিন হাযারেরও বেশী লোক প্রাণ হারায়। তবে অ্যামনেষ্টি ইন্টারন্যাশনাল এ সপ্তাহে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে জানায়, ১৯৮৫ সাল থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত ঐ দুর্ঘটনার কারণে অন্তত ১৫ হাযার লোক মারা যায়। পরবর্তীতে এর প্রতিক্রিয়া হিসাবে আরো ৭ থেকে ১০ হাযার লোক মারা যায়। সরকারী কর্মকর্তারা জানান, পরবর্তী প্রতিক্রিয়ায় আক্রান্ত হয়েছে আরো প্রায় ৮ লাখ। দুর্ভাগ্য হ'ল, ঘটনাস্থলটি এখন গবাদি পশুর বিচরণ ক্ষেত্র ও শিশুদের খেলার মাঠ হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। আরো জানা যায়, বিষাক্ত ভূর্গভস্থ পানি ইতিমধ্যেই খাবার পানি হিসাবে ব্যবহার করা শুরু হয়েছে।

[আল্লাহ পাক তার বান্দাকে হেদায়াতের জন্য পৃথিবীতে মাঝেমধ্যে এ ধরনের গযব প্রেরণ করে থাকেন। সৌভাগ্যবান তারাই, যারা এ থেকে শিক্ষা নিয়ে আল্লাহ্র পথে ফিরে আসে। আর হতভাগ্য তারাই, যারা এগুলিকে প্রাকৃতিক বিষয় বা প্রকৃতির খেয়াল বলে উড়িয়ে দেয়। আল্লাহ তার গযব উঠিয়ে নিন- আমরা সেই প্রার্থনা করি (স.স)]

ধূমপানে দৈনিক ১৩শ' আমেরিকানের মৃত্যু

সিগারেটজনিত রোগে দৈনিক ১৩শ' আমেরিকানের মৃত্যু হচ্ছে। বার্ষিক ৪,৭৫,৫০০ জনের মৃত্যু হচ্ছে সিগারেট জনিত বিভিন্ন রোগে। 'আমেরিকান এন্টিক্যান্সার সোসাইটি'র ভাইস প্রেসিডেন্ট হেক্টর বাটিস্তা এ তথ্য জানিয়েছেন। ১৯ নভেম্বর '০৪ নিউইয়র্কে ৬,০০০ প্যাকেট সিগারেট ধ্বংস করে হাযার হাযার লোকের সিগারেট পরিত্যাগের ঘোষণা উপলক্ষে হেক্টর বাটিস্তা উপরোক্ত উদ্বেগজনক তথ্যটি প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, সিগারেট আমাদেরকে বিভিন্ন জটিল রোগে আক্রান্ত করছে। সিগারেট মানসিক প্রশান্তির জন্যও কোন কাজে লাগে না। কেননা যে জিনিস আয়ু কমায় এবং জটিল রোগে আক্রান্ত করে, তা কি করে মানসিক প্রশান্তি আনবে?

[যালেম শক্তি যখন অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে, তখন এভাবেই তাদের উপরে আল্লাহ্র অদৃশ্য গযব নেমে আসে। এ মূলনীতিটি সকল ব্যক্তিও দেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অতএব, হে অবাধ্য বাংলাদেশী ধূমপায়ীরা! তোমরাও আল্লাহ্র গযবের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও। অথবা তওবা করে বিরত হও (স.স)]

যুক্তরাষ্ট্রে ১ কোটি ২৬ লাখ লোক গত বছর পেট ভরে খেতে পায়নি

অবিশ্বাস্য হ'লেও সত্য যে, প্রাচুর্যে ভরপুর যুক্তরাষ্ট্রের ১ কোটি ২৬ লাখ লোক ২০০৩ সালেও পেট ভরে খেতে পায়নি। ২০০২ সালেও একই পরিমাণ আমেরিকান অভাবে দিনাতিপাত করেছে। সরকারী সূত্রে গত ২১ নভেম্বর এ খবর দেওয়া হয়েছে।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক রিপোর্টে বলা হয়েছে, উপরোক্ত ১২.৬ মিলিয়নের মধ্যে ৩.৯ মিলিয়ন (৩৯ লাখ) আমেরিকান অভাবের সাথে প্রতিনিয়ত যুদ্ধ করে কালাতিপাত করছে। তারা দিনে এক বেলাও তৃপ্তির সাথে খেতে পায়নি। অপর দিকে প্রায় ৬ মিলিয়ন আমেরিকান খাদ্য সংকট মোকাবেলায় খাবারের মেন্যু পরিবর্তন করেছে অর্থাৎ চাহিদার চেয়ে কম পুষ্টিকর খাদ্য খাচ্ছে। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের রিপোর্টে আরো বলা হয়েছে যে, ২০০৩ সালে মোট জনসংখ্যার ১১.২% ঠিকমত খাদ্য পায়নি।

উল্লেখ্য, নিউইয়র্ক সিটিতে অভাবী মানুষের সংখ্যা ২০০৩ সালের তুলনায় ৭% বেড়ে মোট জনসংখ্যার ৩১%-তে দাঁড়িয়েছে।

[গণতন্ত্র ও মুক্তবাজার অর্থনীতির সুখের পায়রাগণ এ দুখী মানুষগুলির জন্য এখন কি সাফাই গাইবেন? অতএব রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য ইমারত ও শূরা ভিত্তিক ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করুন এবং ইসলামী অর্থনীতি চালু করার মাধ্যমে সমাজের সকলের জন্য অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার কায়েম করুন (স.স)]

বিশ্বে বস্ত্র ও তৈরী পোশাক শিল্পের লক্ষ লক্ষ কর্মী আগামী বছর চাকুরী হারাবে

বিশ্বের বস্ত্র ও তৈরী পোশাক শিল্পের লক্ষ লক্ষ কর্মীদের হুঁশিয়ার করে দেওয়া হয়েছে যে, আগামী বছর ৪০ বছরের পুরনো বিশ্ববাণিজ্য নীতির সময়সীমা শেষ হয়ে যাবে এবং তাতে এসব কর্মীদের অনেকেই তাদের কাজ হারাবেন। 'মেইড চায়না' লেবেলযুক্ত তৈরী পোশাক ২০০৭ সাল নাগাদ সারাবিশ্বের তৈরী পোশাক চাহিদার অর্ধেক পূরণ করবে।

মুক্ত বাণিজ্য সংক্রান্ত একটি আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থা বলেছে, জানুয়ারী মাসে দেশভিত্তিক কোটা ব্যবহার অবলুপ্তির অর্থ হচ্ছে, চীন এই শিল্পকে নিয়ন্ত্রণ করবে। কারণ উৎপাদন খরচ চীনে সবচেয়ে কম। প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হ'লে অন্য দেশগুলিকে বিশেষ করে বাংলাদেশ, মরিশাস ও ফিলিপাইনে কর্মীদের বেতন ও শ্রমের মান কমিয়ে দিতে হবে। এদিকে চীন যুক্তরাষ্ট্রকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছে যে, চীনের বস্ত্রশিল্পজাত দ্রব্যের উপর কোন রকম আমদানী কোটা আরোপ করা হ'লে তা দু'দেশের পারস্পরিক বাণিজ্যের উপর মারাত্মক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে।

[সর্বহারাদের সেবায় নিয়োজিত চীন অবশেষে বিশ্বের পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় চলে আসছে। তাদের এই ভূমিকা লক্ষ লক্ষ শ্রমিক-কর্মচারীকে সর্বহারা বানাবে। তখন তাদের কম্যুনিজমের দর্শন থাকবে কোথায়? অতএব বিস্ময়ন নয়, প্রত্যেক দেশের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারকে সম্মান করে সকলকে বাঁচার সুযোগ দিন (স.স)]

থাই সরকারের প্রতারণার নতুন কৌশল (?)

থাই সরকার মুসলমান অধ্যুষিত দেশের দক্ষিণাঞ্চলীয় প্রদেশগুলিতে কাগজের তৈরী ১০ কোটি কবুতর ছেড়েছে। সামরিক বিমান থেকে গত ৫ ডিসেম্বর কবুতরগুলি নিক্ষেপ করা

হয়। দক্ষিণের ৩টি প্রদেশে শান্তি স্থাপনে থাই সরকারের সদিচ্ছার নিদর্শনস্বরূপ কবুতরগুলি এলাকাবাসীকে উপহার দেয়া হয়। এর মধ্যে প্রধানমন্ত্রী থাকসিন সিনাওয়াত্রা স্বাক্ষরিত একটিতে এর প্রাপককে একটি ভাল চাকরি প্রদানের প্রতিশ্রুতির কথা লিখিত আছে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও ঐ এলাকার ভীত-সন্ত্রস্ত মুসলমানদের আস্থা অর্জন করতে পারেনি ব্যাংকক সরকার। কারণ ২ মাস আগে সামরিক হেফাযতে ৮৫ জন মুসলমানের করুণ মৃত্যুর কথা তারা ভুলতে পারেনি। নির্বাচনের একমাস আগে রাজা ভূমিবলের জন্মদিনে কোটি কোটি কাগুজে পায়রা দিয়ে তাদের মনের আগুন নির্বাপিত করা সম্ভব হবে না থাকসিন সরকারের পক্ষে। অত্যাচার নির্যাতন অব্যাহত রেখে কাগুজে পাখি দিয়ে সন্ধি স্থাপনের পাঁয়তারা প্রতারণারই নামান্তর। তাই দক্ষিণের অবহেলিত মালয়ীভাষী মুসলমানরা পায়রা পেয়ে খুশীতো হয়ইনি বরং তারা এই হটকারিতায় আরো ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে। আব্দুল্লাহ হাম আব্দুছ ছামাদ নামক একজন থাই মুসলমান বলেন, আমরা ভিন্ন সংস্কৃতির মানুষ, কাগুজে পায়রা আমাদের ঐতিহ্য নয়।

[কাগুজে নয়, হৃদয়ের সম্পর্ক চাই। এজন্য থাই সরকারের উচিত হবে, ৮৫ জন মুসলমানকে হত্যাকারী থানা কর্মকর্তাদের প্রকাশ্যে ফায়ারিং স্কোয়াডে গুলী করে হত্যা করা। তাহ'লে হয়তবা নিহতদের শুভানুধ্যায়ীদের মনের আগুন কিছুটা হ'লেও কমবে (স.স)]

যুক্তরাষ্ট্র জর্ডানে ৫০টি ক্ষেপণাস্ত্র বিক্রি করছে

বুশ প্রশাসন যুক্তরাষ্ট্রে তৈরী ৫০টি আকাশ থেকে আকাশে নিক্ষেপণযোগ্য অত্যাধুনিক ক্ষেপণাস্ত্র জর্ডানে বিক্রির বিষয়টি অনুমোদন করেছে। মার্কিন সামরিক সূত্র এ খবর দিয়েছে।

জর্ডানে এই ক্ষেপণাস্ত্র ও এর যন্ত্রাংশ বিক্রির ফলে দেশটি যেকোন শত্রুপক্ষের বিমান ধ্বংসের ব্যাপক ক্ষমতা অর্জন করবে।

এই ক্ষেপণাস্ত্র হচ্ছে এআইএম-১২০সি অত্যাধুনিক মাঝারি পাল্লার এয়ার টু এয়ার মিসাইল (অ্যামর‍্যাম)। এগুলি এফ-১৬ জঙ্গী বিমানের সাহায্যে দূর পাল্লায় আঘাত হানতে সক্ষম। এই সমরাস্ত্রের মূল্য প্রায় ৩ কোটি ৯০ লাখ ডলার। এদিকে ইসরাঈল জর্ডানে এই অস্ত্র বিক্রির প্রতিবাদ জানিয়েছে।

[মধ্যপ্রাচ্যকে মার্কিনীরা অস্ত্র বিক্রির বাজার হিসাবে ব্যবহার করছে। পরবর্তীতে এই অস্ত্র তাদের একে অপরের বিরুদ্ধে প্রয়োগের পরিবেশ তারাই সৃষ্টি করে নিবে। যেভাবে সিনিয়র বুশ ১৯৯০ সালে সাদ্দামকে দিয়ে কুয়েতে হামলা চালিয়েছিল। পরে নিজেরা ইরাকে হামলা চালিয়ে তাকে নিরস্ত্র করে। অতঃপর ১৩ বছর যাবৎ অর্থনৈতিক অবরোধ চাপিয়ে রেখে ১৫ লাখ বনু আদমকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়। সবশেষে গণবিধ্বংসী অস্ত্রের মিথ্যা অজুহাত তুলে ২০০৩ সালে ইরাক দখল করে নেয়। অতএব জর্ডানকে সাবধান হওয়া উচিত (স.স)]

বিশ্বে ১৭ কোটি শিশু অপুষ্টিতে ভুগছে

বিশ্বব্যাপী ১৭ কোটিরও বেশী শিশু অপুষ্টিতে ভুগছে এবং অন্তত ১২ কোটি শিশু কখনও স্কুলে যাওয়ার সুযোগ পায় না। বিশ্বের সর্বত্র নতুন প্রজন্মের জীবন রক্ষায় ও মানোন্নয়নে স্বেচ্ছাসেবকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার উপর আলোকপাত করতে গিয়ে ইউনিসেফের নির্বাহী পরিচালক ক্যারোল বেলামি গত ৫ ডিসেম্বর পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে উপরোক্ত তথ্য দেন। সম্মেলনে উপস্থিত স্বেচ্ছাসেবীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, প্রতিকারযোগ্য রোগসমূহ বিশেষ করে ডায়রিয়া, হাম ও ধনুষ্টংকারের মত রোগে এখনও প্রতিবছর ৫ বছর বয়সের নীচে প্রায় ১ কোটি শিশু মারা যায়।

[শিশু খাদ্যে ভেজাল এর অন্যতম প্রধান কারণ। প্রত্যেক দেশের সরকার এদিকে কঠোর দৃষ্টি রাখলে সংশ্লিষ্ট রোগের ব্যাপকতা কমে আসতে পারে (স.স)]

থাইল্যাণ্ডে ২০ কোটি ডলারের মাদকদ্রব্য ধ্বংস

থাইল্যাণ্ড কর্তৃপক্ষ গত ২ ডিসেম্বর আটককৃত সাড়ে ৩ টন মাদকদ্রব্য ধ্বংস করেছে। এগুলির মূল্য ২০ কোটি ডলারেরও বেশী। মাদক চোরাচালান ও এর অপব্যবহারের বিরুদ্ধে থাই কর্তৃপক্ষের চলমান অভিযানের অংশ হিসাবে এগুলি আটক করা হয়। থাই কর্তৃপক্ষ জানায়, তারা ব্যাংককের উত্তরাঞ্চলীয় এভুথাবা প্রদেশে পরিবেশ বান্ধব পদ্ধতিতে সাড়ে ৩ কোটি ট্যাবলেট অর্থাৎ ৩ দশমিক ২ টন মাদকতা সৃষ্টিকারী ট্যাবলেট, ১শ' ৯৫ দশমিক ৩ কেজি হেরোইন, সাড়ে ১৬ কেজি গাজা ও আরো অন্যান্য মাদকদ্রব্য নষ্ট করে দিয়েছে। উল্লেখ্য, গত জুন মাসে জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক মাদক প্রতিরোধ দিবস উপলক্ষ্যে আড়াই টন মাদকদ্রব্য ধ্বংস করা হয়।

[দেশের নাগরিকদের মধ্যে মাদকের বিরুদ্ধে ধর্মীয় অনুশাসন জাগ্রত করার মাধ্যমে এবং মাদকের বিরুদ্ধে সর্বত্র সর্বদা কড়া সরকারী আইন কঠোরভাবে প্রয়োগের মাধ্যমে মাদকের সয়লাব বন্ধ করা সম্ভব (স.স)]

ফ্লু রোগ বিশ্বের প্রাকৃতিক পরিবেশও বিনষ্ট করবে

হংকং-এর একজন চিকিৎসা বিজ্ঞানী হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেছেন, আগামীতে যে প্রাণঘাতী ফ্লু রোগ দেখা দেবে, তা শুধু লাখ লাখ লোকের প্রাণহানিই ঘটাবে না, তা বিশ্বের ইকোসিস্টেম বা প্রাকৃতিক পরিবেশকেও বিনষ্ট করে দেবে। ৪ ডিসেম্বর হংকং-এর একটি পত্রিকায় এ খবর প্রকাশিত হয়।

এশিয়ার বিভিন্ন দেশে ঘাতকব্যাধি বার্ড ফ্লু নির্মূলের ব্যাপারে প্রায় এক বছর ধরে প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকলেও আগামীতে এই রোগ বিশ্বব্যাপী মহামারী হিসাবে দেখা দিতে পারে এবং এই রোগে বিশ্বের ৭০ লাখ লোকের প্রাণহানি ঘটতে পারে। 'বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা'র আশংকা, রোগটি ব্যাপক সংহারী রূপ নিয়ে আবার আবির্ভূত হ'তে পারে। 'হু'র এই সতর্কবানী সত্য হ'লে আগামীতে ঘাতকব্যাধি বার্ড ফ্লু শুধু এশিয়ায় সীমাবদ্ধ থাকবে না; বরং বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়বে।

[বান্দার পাপ বৃদ্ধি পেতে থাকলে তার পরিণামে এ ধরনের অজানিত রোগ সমূহের গযব একে একে মানবতাকে গ্রাস করবে। অতএব কঠোরভাবে ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলার মধ্যেই মানবতার মুক্তি সম্ভব (স.স)]

বিশ্বে ক্ষুধা ও অপুষ্টিতে প্রতি ৫ সেকেণ্ডে একটি করে শিশু মারা যাচ্ছে

জাতিসংঘ বলেছে, প্রতিবছর ক্ষুধা ও অপুষ্টির কারণে বিশ্বে ৫০ লাখের বেশী শিশু মারা যাচ্ছে। এছাড়া অপুষ্টির কারণে উৎপাদনশীলতায় যে প্রভাব পড়ছে, তাতে উন্নয়নশীল বিশ্বর কোটি কোটি ডলার ক্ষতি হচ্ছে এবং বিভিন্ন দেশের জাতীয় আয়-এর ফল হচ্ছে নেতিবাচক। এছাড়া বিশ্বের শিশু জনসংখ্যার অর্ধেক অর্থাৎ একশ' কোটি শিশু দারিদ্র্য, সংঘাত এবং এইডস-এর অভিশাপের শিকার। এছাড়া ১৪০ কোটি লোকের প্রত্যেকে দৈনিক মাত্র দুই ডলার করে আয় করে এবং এরা দরিদ্রতার চরম অভিশাপের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে।

জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষিসংস্থা এফএও তাদের বার্ষিক প্রতিবেদনে বলেছে, বিশ্বের ক্ষুধার্ত মানুষের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। বর্তমানে এই সংখ্যা ৮৫ কোটির বেশী। তবে এফএও বলেছে, ২০১৫ সালের মধ্যে ক্ষুধার্ত ও দরিদ্র লোকের সংখ্যা অর্ধেক করার যে লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে তা পূরণ করা সম্ভব।

এফএও তাদের প্রতিবেদনে যে পরিসংখ্যান তুলে ধরেছে তাতে বলা হয়েছে যে, উন্নয়নশীল বিশ্বে এখন প্রায় ৮৫ কোটি মানুষ অপুষ্টির শিকার এবং এই সংখ্যা ক্রমাগতই বাড়ছে। এই পরিসংখ্যান তুলে ধরে এই সংস্থা বলেছে, এই তথ্য প্রমাণ করে যে, ক্ষুধা নির্বারণের কাজে যথেষ্ট অগ্রগতি হচ্ছে না। এর মানবিক প্রভাবের কথা তুলে ধরে সংস্থাটি বলেছে, প্রতিবছর ৫০ লাখের বেশী শিশু ক্ষুধা ও অপুষ্টির কারণে মারা যাচ্ছে। রোম থেকে সংবাদদাতারা জানান, এর অর্থ হচ্ছে ক্ষুধা ও অপুষ্টির কারণে প্রতি ৫ সেকেণ্ডে একটি করে শিশুর মৃত্যু হচ্ছে। এছাড়া এর প্রভাব পড়ছে কর্মদক্ষতা ও উৎপাদনশীলতার উপর।

সংস্থাটি বলেছে, বিশ্বের ৩৫টি দেশে ক্ষুধা ও অপুষ্টির সমস্যা ভয়াবহ এবং এদের মধ্যে বেশীরভাগই আফ্রিকা মহাদেশে। এসব দেশে খাদ্যসংকট সবচেয়ে তীব্র। তবে একই সঙ্গে জনবহুল দু'টি দেশ চীন ও ভারতে পরিস্থিতির অবনতির কারণে অবস্থা যে আরো খারাপ হচ্ছে এফএও সেদিকে নযর দিয়েছে। তবে এফএও বলেছে, অপুষ্টি শুধু উন্নয়নশীল বিশ্বে সীমাবদ্ধ নয়, শিল্পোন্নত বিশ্বের ৯০ লাখ মানুষ অপুষ্টির শিকার। এছাড়া অর্থনৈতিক মানদণ্ডে যেসব দেশ উন্নয়নশীল বিশ্ব ও উন্নত দুনিয়ার মধ্যবর্তী স্থানে রয়েছে এমন সব দেশে প্রায় তিন কোটি মানুষ অপুষ্টির শিকার হচ্ছে। ইউনিসেফ গত ৯ ডিসেম্বর তার বার্ষিক রিপোর্টে বলেছে, বিশ্বের শিশু সনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক অর্থাৎ একশ' কোটির বেশী শিশু দারিদ্র্য, ভয়াবহ সংঘাত ও এইডস-এর অভিশাপে জর্জরিত। এতে বলা হয়, ১৯৮৯ সালের শিশুদের অধিকার সংক্রান্ত কনভেনশন গৃহীত হয়। কিন্তু বিভিন্ন দেশের সরকার মানবাধিকার ও আন্তর্জাতিক সংস্কার কর্মসূচী বাস্তবায়নে ব্যর্থ হচ্ছে বলে এই কনভেশন বাস্তবরূপ পাচ্ছে না।

ইউনিসেফ দেখেছে যে, ৬০ কোটি শিশুর পর্যাপ্ত আশ্রয় নেই। ৪০ কোটি শিশু বিশুদ্ধ পানি পায় না। ২৭ কোটি শিশু স্বাস্থ্য বা চিকিৎসা সুবিধা পায় না এবং ১৪ কোটি শিশু, বিশেষ করে মেয়ে স্কুলে যাবার সুযোগ পায় না। এদিকে আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থা বলেছে, বিশ্বের ১৪০ কোটি শ্রমিক দৈনিক মাত্র ২ ডলার আয় করে। তাতে তারা চরম দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসে বাধ্য হয়। আবার এদের মধ্যে প্রায় ৫৫ কোটির আয় দৈনিক ১ ডলারের কম। এছাড়া প্রায় ২০ কোটি লোকের কোন চাকরি নেই। তারা বেকার।

[পুঁজিবাদী অর্থনীতির ছোবলে ক্রমেই বিশ্বে দরিদ্র, অনাহারী ও বেকার মানুষের সংখ্যা বাড়ছে। এ থেকে বাঁচার জন্য অনতিবিলম্বে দেশে ইসলামী অর্থনীতি চালু করুন। তাহ'লে ধনী ও দরিদ্রের ব্যবধান হ্রাস পাবে। নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। ইনশাআল্লাহ শিশু মৃত্যুর হার কমবে। ইসলামপন্থী ধনী ও শিল্পপতিগণ সীমিতভাবে হ'লেও স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানে ইসলামী অর্থনীতির বাস্তবায়ন শুরু করতে পারেন (স.স)]

মুসলিম জাহান

ইরানের পারমাণবিক বোমা বরদাশত করা হবে না

-প্রেসিডেন্ট বুশ

মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ ইরান ও উত্তর কোরিয়াকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেছেন, পারমাণবিক অস্ত্র তৈরীর যেকোন চেষ্টার বিরুদ্ধে বিশ্ব ঐক্যবদ্ধ এবং তাদের এ ধরনের যেকোন প্রচেষ্টা নস্যাৎ করে দেয়া হবে। তিনি চিলির সান্টিয়াগোতে এশিয়া-প্যাসিফিক অর্থনৈতিক সহযোগিতা ফোরামের (এপেক) শীর্ষ সম্মেলনে ভাষণদানকালে তার ভাষায় 'শয়তানের অক্ষ শক্তি' বলে কথিত এ দু'টি দেশের পারমাণবিক কর্মসূচীর তীব্র সমালোচনা করে একথা বলেন। তিনি বলেন, ইরান কোন পরমাণু বোমা তৈরী করতে চাইলে তা বরদাশত করা হবে না।

[অবশ্যই বরদাশত করতে হবে। উত্তর কোরিয়া বা ইরান আমেরিকার কলোনী নয় এবং পৃথিবীর মালিকানা আমেরিকার নয়, যে কেবল তার হাতেই বোমা থাকবে, অন্যদের হাতে নয়। অতএব শক্তির ভারসাম্য সৃষ্টির জন্য অন্যদের হাতেও পারমাণবিক বোমা থাকা প্রয়োজন। অন্যথায় কারু নিকটে না থাকাই উচিত (স.স)]

পূর্ব তিমুরের ৬১ মুসলমান বহিষ্কার

ক্ষুদ্র দেশ পূর্ব তিমুর রাজধানী দিলিতে একমাত্র মসজিদের কাছে বসবাসরত প্রায় তিনশ' মুসলমানকে আটক করার পর ৬১ জনকে প্রতিবেশী ইন্দোনেশিয়ায় বিতাড়িত করেছে। এই ঘটনা ইন্দোনেশিয়ার জনগণের মনে দারুণ ক্ষোভের সৃষ্টি করেছে। স্থানীয় প্রচার মাধ্যমগুলি এই ঘটনাকে ক্যাথলিক প্রধান পূর্ব তিমুরের ইসলামের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা হিসাবে অভিহিত করেছে। ১৯৯৯ সালে পূর্ব তিমুর ইন্দোনেশিয়া থেকে পৃথক হয়ে যাওয়ার পূর্ব থেকেই মুসলমানরা এখানে বসবাস করে আসছিল। জাকার্তায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিদেশে অবস্থানরত ইন্দোনেশীয়দের রক্ষা দফতরের পরিচালক ফেরি এ্যাডামহার বলেছেন, দিলি থেকে ৬১ জন মুসলমানকে বহিষ্কার করে ইন্দোনেশিয়ায় পাঠানো হয়েছে। তাদেরকে বলা হচ্ছে, তারা এখানে অবৈধভাবে বসবাস করছে।

[মানবাধিকারের সোল এজেন্ট আমেরিকা এখন কি বলবে? তারাই পূর্ব তিমুরকে ইন্দোনেশিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করেছিল খৃষ্টানদের মানবাধিকার রক্ষার ধুয়া তুলে। অথচ মুসলিম সংখ্যা গরিষ্ট ইন্দোনেশিয়ায় যুগ যুগ ধরে খৃষ্টানরা শান্তির সঙ্গে বসবাস করে আসছিল (স.স)]

রোমান যুগের মমি আবিষ্কৃত

মিসরের রাজধানী কায়রো থেকে ৩৭৫ মিলোমিটার পশ্চিমে বাহারিয়া মরুদ্যানে সোনালী মমির উপত্যকায় সম্প্রতি ভূগর্ভস্থ একটি সমাধিতে ৯টি মমি পাওয়া গেছে। এর মধ্যে ২টি মমি খৃষ্টপূর্ব দেড়শ' বছর আগের মিসরীয় রোমান যুগের। মিসরের পুরাতত্ত্ব বিভাগের বিশেষজ্ঞগণের ধারণা, ঐ মরু উপত্যাকাটিতে ১০ হাযার মমি আছে। একটি পুরাতত্ত্ব দল ঐ স্থান থেকে ২০টি সোনালী আবরণে ঢাকা মমি দেখতে পায়। এ পর্যন্ত ঐ এলাকায় ২৩৪টি মমি আবিষ্কৃত হয়েছে।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

অন্ধদের জন্য 'ইলেকট্রনিক চোখ'

জাপানের বিজ্ঞানীরা এমন একটি ইলেকট্রনিক চোখ আবিষ্কার করেছেন যার সাহায্যে অন্ধ ব্যক্তিরা সম্পূর্ণ নিরাপদে ব্যস্ত সড়ক পার হ'তে সক্ষম হবেন। বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবিত চশমার সাহায্যে অন্ধ ব্যক্তিরা পথচারীদের রাস্তা পারাপারের স্থান, রাস্তার প্রশস্ততা ও ট্রাফিক লাইটের রং চিনতে পারবেন। ১৯ নভেম্বরে বৃটেনের ইনষ্টিটিউট অব ফিজিক্স থেকে প্রকাশিত 'মিজারমেন্ট সাইন্স অ্যাণ্ড টেকনোলজি' জার্নালে এ তথ্য প্রকাশিত হয়। নব উদ্ভাবিত এই ক্যামেরায় সিঙ্গেল ক্যামেরা ব্যবহার করা হয়েছে। এই ক্যামেরায় একটি ক্ষুদ্র কম্পিউটার ও ভয়েস স্পিচ সিষ্টেম রয়েছে এবং এই সিষ্টেম থেকেই রাস্তা পারাপার সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য অন্ধ ব্যক্তিকে জানানো হবে।

সবচেয়ে দ্রুত গতিসম্পন্ন কম্পিউটার

জাপানে ইয়োকোহামা ইনষ্টিটিউট ফর আর্থ সায়েন্সের এনইসি আর্থ সিমুলেটর নামের কম্পিউটারটি বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুত গতির কম্পিউটার। এটি প্রতি সেকেণ্ড ৩৫.৬ ট্রিলিয়ন বার গণনা করতে পারে। কম্পিউটারটি আবহাওয়া পরিবর্তন এবং বৈশ্বিক উষ্ণতা সম্পর্কেও ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে। এর ৫ হাযার ১০৪টি প্রসেসর এমন একটি বিশাল কেবিনেটে রাখা হয়েছে যা চারটি টেনিস কোর্টের সমান।

অতিরিক্ত কম্পিউটার ব্যবহারে চোখে গ্লুকোমা হ'তে পারে

অতিরিক্ত কম্পিউটার ব্যবহারকারীদের বিশেষ করে যাদের দৃষ্টিশক্তি কম তাদের চক্ষুরোগ গ্লুকোমার ঝুঁকি রয়েছে। এই রোগ থেকে অন্ধত্ব দেখা দিতে পারে। গত ১৬ নভেম্বর একটি বিশেষ মেডিকেল জার্নালে এ সংক্রান্ত একটি গবেষণার ফলাফল প্রকাশিত হয়।

জাপানের চিকিৎসকরা ১০ হাযার ২০০ জাপানী শ্রমিকের দৃষ্টিশক্তি ও গ্লুকোমার লক্ষণ মূল্যায়নের মাধ্যমে এই গবেষণা চালান।

গবেষণায় দেখা যায়, যারা অতিরিক্ত কম্পিউটার ব্যবহার করেন তাদের গ্লুকোমাসহ অন্যান্য চক্ষু রোগের লক্ষণ দেখা যায়। যেসব শ্রমিক দৈনিক ৮ ঘন্টার বেশী সময় কম্পিউটার স্ক্রিণের সামনে বসে কাজ করে তাদের গ্লুকোমা হওয়ার ঝুঁকি যারা হালকা ও মাঝারি ধরনের কম্পিউটার ব্যবহার করেন তাদের চেয়ে দ্বিগুণ।

শব্দের ১০ গুণ গতির মনুষ্যবিহীন মার্কিন জেট

মার্কিন মহাশূন্য সংস্থা 'নাসা' পরীক্ষামূলকভাবে একটি মনুষ্যবিহীন অতি দ্রুতগামী জেট উড়িয়েছে। প্রাথমিকভাবে এর গতি হচ্ছে শব্দের গতির ১০ গুণের চেয়ে সামান্য কম। এটি কোন জেটের জন্য রেকর্ড পরিমাণ গতি। এই এক্স-৪৩ এ সুপারসনিক কম্বাশ্চন র‍্যামজেট (স্ক্রামজেট) প্রশান্ত মহাসাগরে মার্কিন নৌ-বাহিনীর পরীক্ষা এলাকায় উড়ানো হয়। ৩ দশমিক ৭ মিটার দীর্ঘ এই জেটটি ইতিপূর্বেকার জেটের গতি ভঙ্গ করেছে। পূর্বে এ ধরনের জেটের (ম্যাচ ৬.৮৩) গতি ছিল শব্দের চেয়ে ৬ দশমিক ৮৩ গুণ (প্রায় ৭ গুণ)। বর্তমান জেট-ম্যাচ-১০ তেত্রিশ কিলোমিটার (১ লাখ ১১ হাযার ফুট) উঁচুতে ঘন্টায় ১১ হাযার কিলোমিটার (৬ হাযার ৮শ' মাইল) বেগে চলতে পারে।

ক্যান্সারের নতুন ওষুধ আবিষ্কার

ক্যান্সার আক্রান্ত রোগীদের জন্য একটি সুখবর নিয়ে এসেছেন সুইজারল্যাণ্ডের চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা। তারা 'এভাষ্টিন' নামে নতুন একটি ওষুধ আবিষ্কার করেছেন। যা ক্যান্সার আক্রান্ত ব্যক্তি ডাক্তারের নির্দেশমত পথ্যের সঙ্গে সেবন করলে তার আয়ু বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। ওষুধটির উদ্ভাবক 'রোচে এণ্ড গেনেন্টেক কোম্পানী'। গত ৩০ নভেম্বর সুইজারল্যাণ্ডের বাসেল-এ এভাষ্টিন আবিষ্কারের কথা ঘোষণা করা হয়। তারা বলেছে, মেটাস্টেটিক কলোরেক্টাল ক্যান্সারে আক্রান্ত রোগীরা 'কেমোথেরাপি'র সঙ্গে এই ওষুধ খেলে অতিরিক্ত দুই মাস বেঁচে থাকবেন। এই ধরনের ক্যান্সারে বিশ্বে প্রতিবছর প্রায় ১০ লাখ লোক আক্রান্ত হচ্ছে এবং শতকরা ৫০ জনই মৃত্যুবরণ করছে। শুধু 'কেমোথেরাপি'র দ্বারা ক্যান্সারের চিকিৎসা করলে বেশিরভাগ রোগীই মারা যায়। কিন্তু এভাষ্টিনের সঙ্গে কেমোথেরাপি দেওয়া হ'লে রোগীকে বাঁচানো সম্ভব বলে সুইস কোম্পানীটি জানায়। ন্যাশনাল ক্যান্সার ইনস্টিটিউট-এর অর্থায়নে ৮২৯ জন রোগীর উপর গবেষণা চালিয়ে রোচে এণ্ড গেনেন্টেক কোম্পানী এভাষ্টিনের কার্যকারিতার প্রমাণ পেয়েছে।

ব্রেইন ওয়েভের সাহায্যে কম্পিউটার নিয়ন্ত্রণ

আধুনিক বিজ্ঞানের বিস্ময় কম্পিউটার অনেক জটিল গাণিতিক সমস্যা এক নিমিষে সমাধান করে দিতে পারে এই কম্পিউটার। শুধু কি তাই? খেলাধুলা থেকে শুরু করে বিশ্বের কোথায় কি ঘটছে এই কম্পিউটার তা আমাদের হাতের মুঠোর মধ্যে এনে দিয়েছে ইন্টারনেটের মাধ্যমে। তবে এত কিছুর পরও এর পেছনে একজনকে থাকতে হচ্ছে। কি-বোর্ডের বোতাম টিপে টিপে এগুতে হচ্ছে, কিন্তু এমন যদি হ'ত চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে কার কারসর নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে কম্পিউটারকে কাঙ্ক্ষিতভাবে সচল করে তুলত তাহ'লে খুবই মজা হ'ত। তখন বিকলাঙ্গ ও পঙ্গুরাও অনায়াসে কম্পিউটার ব্যবহার করতে পারতেন। অবিশ্বাস্য হ'লেও সত্য- নিউইয়র্কের একদল বিজ্ঞানী এই অসম্ভবকে সম্ভব করার চেষ্টা করছেন। তাদের প্রচেষ্টায় ৬৮টি ইলেকট্রোড লাগানো টুপি পরে ৪ জন বিকলাঙ্গ সফলভাবে চিন্তাশক্তির সাহায্যে কম্পিউটারের কারসরকে সচল করতে পেরেছেন। এই ৪ জনের মধ্যে দু'জন আংশিক বিকলাঙ্গ। তার হুইল চেয়ারেই চলা-ফেরা করেন। এর আগের একটি পরীক্ষায় দেখা গেছে, বানরদের মাথায় ইলেকট্রোড লাগিয়ে দিলে তারাও কম্পিউটারকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। নিউইয়র্কের ন্যাশনাল একাডেমী অব সাইয়েন্সে ব্রেইন ওয়েভের সাহায্যে কম্পিউটার নিয়ন্ত্রণের এই তথ্য প্রকাশ করা হয়।

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

পবিত্র মাহে রামাযান উপলক্ষ্যে দেশব্যাপী দাওয়াতী সপ্তাহ ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচী

(২য় কিস্তি)

চিতলমারী, বাগেরহাট, ৬ নভেম্বর, শনিবারঃ অদ্য বাদ যোহর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র যৌথ উদ্যোগে চিতলমারী বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলের আয়োজন করা হয়। আন্দোলনের যেলা সভাপতি জনাব ডাঃ ইস্রাফীল হোসায়েন-এর সভাপতিত্বে ও 'যুবসংঘে'র যেলা সভাপতি জনাব মাওলানা মুহাম্মাদ যুবাইর-এর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবদুল ওয়াদূদ, সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান। উক্ত কর্মী প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে বক্তব্য রাখেন সাতক্ষীরা যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ ফযলুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আলতাফ হোসায়েন, বাগেরহাট যেলা 'আন্দোলনে'র সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ ও সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব সরদার মুহাম্মাদ আশরাফ হোসায়েন প্রমুখ।

গোবরচাকা, খুলনা, ৭ নভেম্বর, রবিবারঃ অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' খুলনা সাংগঠনিক যেলার যৌথ উদ্যোগে যেলা সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ জাহাঙ্গীর আলম-এর সভাপতিত্বে গোবরচাকা মুহাম্মাদিয়া জামে মসজিদে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় মজলিসে আমেলা সদস্য জনাব গোলাম মুক্তাদির বাবু, 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ, খুলনা আলিয়া মাদরাসার মুহাদ্দিছ শাইখ মুনাওয়ার হোসায়েন মাদানী, বাগেরহাট যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডাঃ মুহাম্মাদ ইস্রাফীল, সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান, সাতক্ষীরা যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ ফযলুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক আলতাফ হোসায়েন।

সাতক্ষীরা, ৮ নভেম্বর, সোমবারঃ অদ্য বাদ যোহর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' সাতক্ষীরা সাংগঠনিক যেলার যৌথ উদ্যোগে বাঁকাল দারুল হাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ কমপ্লেক্স জামে মসজিদে এক কর্মী প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কর্মী প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম ও 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ।

ইসলামী সম্মেলন ০৪

আহলেহাদীছ আন্দোলন কোন মানব রচিত মতবাদ-এর আন্দোলন নয়। ইহা আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ অহীর বিধান প্রতিষ্ঠার আন্দোলন- আমীরে জামা'আত

ভবানীগঞ্জ, রাজশাহী, ২৫ নভেম্বর, বৃহস্পতিবারঃ অদ্য বাদ মাগরিব রাজশাহী যেলার বাগমারা থানার অন্তর্গত ভবানীগঞ্জ এলাকা 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর উদ্যোগে ভবানীগঞ্জ (চাঁদপাড়া) হেলিপ্যাড ময়দানে অনুষ্ঠিত ইসলামী সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীর, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত কথা বলেন।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আবুল কালাম আযাদ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত এলাকা সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর নায়েবে আমীর সঊদী মাব'উছ শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন খুলনা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ জাহাঙ্গীর আলম, হাফেয মাওলানা আখতার, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ এস,এম, আব্দুল লতীফ, 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক এ,এস,এম, আযীযুল্লাহ, যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ফারূক আহমাদ, নরসিংহপুর ফাযিল মাদরাসার অধ্যক্ষ মাওলানা মুহসিন, তাহেরপুর এলাকা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আবুল কালাম আযাদ, যেলা 'আন্দোলন'-এর কর্মপরিষদ সদস্য জনাব আলহাজ আইয়ুব হোসেন, ডাঃ মনছুর আলী প্রমুখ।

আখেরাতে মুক্তির লক্ষ্যে আহলেহাদীছ আন্দোলনে শরীক হৌন

-আমীরে জামা'আত

গাবতলী, বগুড়া, ২৬ নভেম্বর, শুক্রবারঃ অদ্য বাদ আছর বগুড়া যেলার গাবতলী এলাকা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে গাবতলী পাইলট উচ্চবিদ্যালয় ময়দানে অনুষ্ঠিত বিশাল ইসলামী সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীর, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত কথা বলেন।

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর নায়েবে আমীর, সঊদী মাব'উছ শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফীর সভাপতিত্বে ও যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুর রঊফের সহ-সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ইসলামী সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রামের অধ্যাপক ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক মাওলানা হাফীযুর রহমান, 'দারুল ইফতা'র সদস্য ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর শিক্ষক মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান, হাফেয মাওলানা আখতার, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ এস,এম, আব্দুল লতীফ, বগুড়া যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মাওলানা নূরুল ইসলাম, যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক জনাব আব্দুর রহীম প্রমুখ।

ঈদ পুনর্মিলনী

১৫ নভেম্বর বুড়িচং, কুমিল্লাঃ অদ্য বিকাল ৪ ঘটিকায় স্থানীয় আল-হেরা মডার্ণ একাডেমী ময়দানে এক ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত হয়। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' বুড়িচং এলাকার উদ্যোগে আয়োজিত ঈদ পুনর্মিলনীতে সভাপতিত্ব করেন 'আন্দোলন'-এর বুড়িচং শাখা সভাপতি জনাব ইদ্রীস মিয়া ভূঁইয়া। 'যুবসংঘে'র এলাকা সভাপতি মুহাম্মাদ ইব্রাহীমের পরিচালনায় 'যুবসংঘে'র সাবেক কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক জনাব মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন-এর উদ্বোধনী ভাষণের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কুমিল্লা যেলা সভাপতি ও জগতপুর এ.ডি.এইচ. সিনিয়র মাদরাসার উপাধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মাদ ছফিউল্লাহ। প্রধান বক্তা ছিলেন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ। এ ছাড়া 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র সাবেক ও বর্তমান যেলা ও এলাকা নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। বৈচিত্র্যময় আলোচনা পর্বের পর শতাধিক নেতা-কর্মীর সমন্বয়ে বর্ণাঢ্য র‍্যালী বুড়িচং উপযেলা সদরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে। র‍্যালীতে 'এসো হে যুবক ও তরুণ, তাওহীদী যুব কাফেলায়' জাগরণীটি সমস্বরে পরিবেশিত হয়। এতে এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

তাবলীগী সভা

জলাইডাঙ্গা, রংপুর, ২০ নভেম্বর, শনিবারঃ অদ্য বাদ ফজর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' জলাইডাঙ্গা এলাকার যৌথ উদ্যোগে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়।

রংপুর যেলা কর্মপরিষদ সদস্য মুহাম্মাদ লাল মিয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত তাবলীগী সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ জনাব এস,এম, আব্দুল লতীফ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন অত্র এলাকার সভাপতি মুহাম্মাদ লোকমান হোসাইন, যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মুহাম্মাদ ওয়াক্কাস আলী, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়ারেছ প্রমুখ।

মহিলা সমাবেশ

কানুদাসপাড়া, রংপুর, ২০ নভেম্বর, শনিবারঃ অদ্য বাদ যোহর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' শঠিবাড়ী এলাকার উদ্যোগে কানুদাসপাড়া হরিরামপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক মহিলা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

'আন্দোলন'-এর শঠিবাড়ী এলাকা সভাপতি জনাব আব্দুল হাদী মাষ্টার-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মহিলা সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ জনাব এস,এম, আব্দুল লতীফ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন রংপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর কর্মপরিষদ সদস্য মুহাম্মাদ লাল মিয়া, অত্র মসজিদের পেশ ইমাম মাওলানা আব্দুর রশীদ প্রমুখ। উক্ত সমাবেশে দুই শতাধিক মহিলা যোগদান করেন।

মির্জাপুর, রংপুর, ২১ নভেম্বর, রবিবারঃ অদ্য সকাল ১০ ঘটিকায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' শঠিবাড়ী এলাকার উদ্যোগে মির্জাপুরে মাষ্টার আব্দুল হাদী ছাহেব-এর বাসভবনে এক মহিলা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

শঠিবাড়ী এলাকা সভাপতি জনাব মাষ্টার আব্দুল হাদীর সভাপতিত্বে ও 'যুবসংঘে'র সদস্য মুহাম্মাদ রাফীউল ইসলামের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত মহিলা সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ জনাব এস,এম, আব্দুল লতীফ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর যেলা কর্মপরিষদ সদস্য মুহাম্মাদ লালমিয়া, যেলা 'যুবসংঘে'র সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়ারেছ প্রমুখ। উক্ত মহিলা সমাবেশে প্রায় দুইশত মহিলা যোগদান করেন।

জনমত কলাম

'তাফসীরুল কুরআন' প্রবন্ধ প্রসঙ্গে

'আত-তাহরীক' ৮ম বর্ষ ৩য় সংখ্যায় প্রকাশিত ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব লিখিত 'তাফসীরুল কুরআনঃ কিছু কথা' প্রবন্ধটি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। লেখক যে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা আমাদেরকে উপহার দিয়েছেন, তা সত্যিই অতুলনীয়। লেখকের জ্ঞানের গভীরতা দেখে আমরা অত্যন্ত অভিভূত। এজন্য আমরা আমাদের অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে তাঁকে মোবারকবাদ জানাচ্ছি। তাঁর সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি। দো'আ করি তিনি যেন আমাদেরকে গোটা কুরআন শরীফের ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক তাফসীর উপহার দিতে পারেন। তবে তার আগে আগামী সংখ্যাতেই 'তাফসীর মা'রেফুল কুরআন'-এর যে সমস্ত জায়গায় যঈফ হাদীছ ভিত্তিক আলোচনা রয়েছে, তা খণ্ডন করে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করার জন্য মাননীয় লেখকের প্রতি আকুল আবেদন জানাচ্ছি।

** ডাঃ আনীস বিন নাছির*
বেবী হোমিও হল, কাটখইর বাজার, নওগাঁ।

ভাসানী নভোথিয়েটারঃ একবার দেখলে দ্বিতীয়বার কেউ যাবে না

গত ৩০শে নভেম্বর '০৪ মঙ্গলবার বিকেল ২-টার শো-তে প্রবেশ করলাম স্বপ্নের নভোথিয়েটারে সরাসরি আকাশের জ্ঞান হাছিল করার জন্য। ১১২ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত বিশ্বের অন্যতম সেরা ঢাকার এই 'ভাসানী নভোথিয়েটার' গত ২৫শে সেপ্টেম্বর'০৪ চালু হবার পরে এদিন বড় আশা নিয়ে সেখানে গিয়েছিলাম। কিন্তু হতাশ হয়েছি দারুণভাবে। বিশাল এলাকা জুড়ে নির্মিত এই বিল্ডিংয়ের নভোথিয়েটারের সামান্য জায়গাটুকু বাদ দিলে বাকী সবটুকুই বেকার মনে হবে। টয়লেট এলাকায় ঢুকলেই দুর্গন্ধ পাওয়া যাবে। অতঃপর থিয়েটার গৃহে ঢুকলেই আপনার মেযাজ বিগড়ে যাবে। কেননা ২৭৫টি আসনের সবগুলি খাড়াভাবে উপর-নীচ করে সাজানো। সকলে হুড়োহুড়ি করে উপরে উঠে আগেই সীট দখল করে নেয়। কারণ উপর থেকে দেখলে পর্দা সরাসরি সম্মুখে থাকে। তখনই বুঝা যায় কেন আগে প্রবেশ করার জন্য বাইরে ও ভিতরের ফ্লোরে লাইন পড়ে। যদি সীট প্ল্যানটা সমতল হ'ত, তাহ'লে কেউ আগে-পিছে বসায় বিড়ম্বনা অনুভব করতো না।

দ্বিতীয়তঃ সীট যেহেতু খাড়াভাবে সাজানো, সেহেতু ফোল্ডিং চেয়ারে চিৎ হয়ে শুয়ে ছাড়া আকাশ দেখার উপায় নেই। ফলে এসি রুমে শুয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই অনেককে ঘুমিয়ে নাক ডাকাতে শোনা গেল।

তৃতীয়তঃ পরিচালক শুরুতে কোনরূপ ভূমিকা ছাড়াই চারদিকে চারবার তীর চিহ্ন মেরে 'চেক' 'চেক' বলে বিকট চীৎকার করেন, যার কোনই প্রয়োজন ছিল না। এ সময় উচিত ছিল কুরআনের আয়াত পাঠ ও অনুবাদের মাধ্যমে আল্লাহর সৃষ্টি কৌশল বর্ণনা করা এবং সৌরজগত সম্পর্কে সংক্ষেপে ধারণা দেওয়া। আধা ঘন্টার অনুষ্ঠানে আমরা জানতে পারলাম না কোন গ্রহ পরিচিতি। তবে জানলাম কিছুটা রাশি পরিচিতি। যেমন কন্যারাশি, বৃষরাশি, বৃশ্চিক রাশি, সিংহরাশি ইত্যাদি। বেদ-পুরানের কল্পিত গল্পের ভিত্তিতে এসব রাশি সৃষ্টির ও নামকরণের ব্যাখ্যা দেওয়া হ'ল।

চতুর্থতঃ ভীষণ ধুম-ধড়াক্কা শব্দে এবং দ্রুত ঘূর্ণায়নের মাধ্যমে আকাশ দেখতে গিয়ে মাথা ঘুরে যায় এবং তখন চোখ বুঁজানো ছাড়া কোন উপায় থাকে না। অতঃপর ১০ মিনিট বিরতির মধ্যে উচ্চ শব্দে অর্থহীন গান-বাজনা দিয়ে অবশেষে দৌড়রত একদল মহিষের ছবি দিয়ে আফ্রিকা মহাদেশের ছবি দেখানো শুরু হয়, যা চলে প্রায় এক ঘন্টা যাবত। যাতে নভোজগতের কিছু নেই। অথচ নাম হ'ল নভোথিয়েটার। সেটা এমন আনাড়ীভাবে দেখানো হয় যে, কখনো কখনো পুরা একটা মহিষই বিরাট পর্দা জুড়ে থাকে। যা দর্শকের মধ্যে বিরক্তির উদ্রেক করে। যার প্রমাণ দেখা গেল, প্রথম পর্ব শেষ হবার আগেই অনেকে চলে গেলেন ও দ্বিতীয় পর্বের মাঝামাঝি থেকে পুনরায় সব বের হ'তে থাকলেন।

আমরা বলতে চাই, এই ধরনের একটা বিশাল অংকের প্রজেক্ট শুধু আনাড়ী ও সম্ভবতঃ অধার্মিক লোকের হাতে পড়ে দ্রুত অপাংক্তেয় হ'তে চলেছে। কোন রুচিশীল ও জ্ঞানপিপাসু ব্যক্তি এখানে দ্বিতীয়বার আসবেন না এবং কাউকে সেখানে যেতেও উদ্বুদ্ধ করবেন না, এটা সুনিশ্চিত। কারণ এখানে শেখার কিছুই নেই। এর চাইতে ঢের উন্নতমানের শিক্ষনীয় সিডি অল্প পয়সায় বাজারে কিনতে পাওয়া যায়, যা ঘরে বসে টিভি ও কম্পিউটারে দেখা যায়। আমরা উক্ত নভোথিয়েটারের মাধ্যমে কুরআনী বিজ্ঞানের আলোকে দর্শকদের মধ্যে বিশুদ্ধ জ্ঞান বিতরণের আহ্বান জানাই।

সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বিষয়টি ভেবে দেখবেন বলে আশা করি।

** মহিব্বুর রহমান হেলাল*
৩য় বর্ষ আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

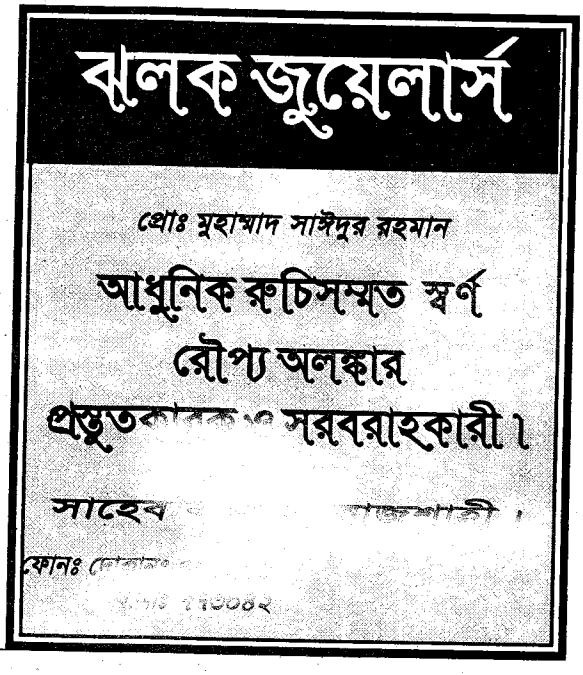

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্নঃ (১/১২১)ঃ ওআইসি-র অঙ্গসংস্থা 'ইসলামী ফিক্বহ একাডেমী' ১৯৮৬ সালে আম্মানে অনুষ্ঠিত বৈঠকের ৬ নং প্রস্তাবে পৃথিবীর সর্বত্র একইদিনে ছিয়াম ও ঈদ পালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বর্তমানে কিছু লোককে দেখা যাচ্ছে, তারা মক্কা শরীফের সাথে মিলিয়ে একই দিনে ছিয়াম ও ঈদ পালনে উৎসুক। শারঈ দৃষ্টিকোণ থেকে এটা কি সঠিক হবে?

-মাহবূবুর রহমান
গাছবাড়ী, কানাইঘাট, সিলেট।

উত্তরঃ শরী'আতের দৃষ্টিতে এটি সঠিক হবে না। কেননা আল্লাহ পাক বলেন, فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি (রামাযানের) এ মাস পাবে, সে যেন ছিয়াম রাখে' *(বাক্বারাহ ১৮৫)*। 'এ মাস পাবে' অর্থ এ মাসের চাঁদ দেখতে পাবে। (২) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوْا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاَثِيْنَ– 'তোমরা চাঁদ দেখে ছিয়াম রাখো ও চাঁদ দেখে ছিয়াম ভঙ্গ কর। যদি চাঁদ তোমাদের নিকটে আচ্ছন্ন থাকে, তাহ'লে শা'বান ত্রিশ দিন পূর্ণ করে নাও' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৯৭০ 'ছাওম' অধ্যায়, 'চাঁদ দেখা' অনুচ্ছেদ)*। উপরোক্ত দলীল সমূহ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ছিয়াম ও ঈদের জন্য চাঁদ দেখা শর্ত। এক্ষণে এই চাঁদ দেখার বিষয়টি অঞ্চল বিশেষের সঙ্গে সম্পৃক্ত, না বিশ্বের যেকোন প্রান্তে একজন মুমিন চাঁদ দেখলেই পৃথিবীর সকল দেশের সকল মুমিনের জন্য তা প্রযোজ্য হবে? যেমন আজকাল বিভিন্ন আধুনিক মিডিয়ার মাধ্যমে চাঁদ দেখা ও তা সর্বত্র সঙ্গে সঙ্গে প্রচারের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

এর জবাব রাসূল (ছাঃ)-এর ভাষায় নিম্নরূপঃ

إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لاَنكْتُبُ وَلاَنَحْسُبُ، الشهرُهكذا وهكذا وهكذا وعَقَدَالإِبْهَامَ فى الثالثة، ثم قال: الشهرُهكذا وهكذا وهكذا، يعنى تمامَ الثلاثين–

'আমরা নিরক্ষর উম্মৎ। আমরা লিখতেও জানিনা, হিসাবও জানিনা। মাস হ'ল এরূপ, এরূপ ও এরূপ। তৃতীয়বারে তিনি বুড়ো আঙ্গুল মুষ্টিবদ্ধ করলেন। রাবী ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, এর দ্বারা তিনি প্রথমবারে ২৯ দিন ও পরের বারে ৩০ দিন বুঝালেন। অর্থাৎ চান্দ্র মাস হ'ল একবার ২৯ দিনে, একবার ৩০ দিনে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৯৭১)*।

উপরোক্ত জবাবে এটা পরিষ্কার যে, চাঁদ দেখার জন্য দূরবীক্ষণ যন্ত্র বা অনুরূপ কোন আধুনিক যান্ত্রিক পদ্ধতি ও হিসাব-নিকাশের প্রয়োজন নেই। স্বাভাবিক চোখে এক অঞ্চলের কেউ চাঁদ দেখলেই সেই অঞ্চলের সকলের জন্য তা প্রযোজ্য হবে। সাথে সাথে এ মূলনীতি ঠিক রাখতে হবে যে, রামাযান কখনোই ৩০ দিনের বেশী হবে না এবং ২৯ দিনের কমে হবে না। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, شَهْرَا عِيْدٍ لاَ يَنْقُصَانِ: رمضانُ و ذوالحجة 'একই বছরে দুই ঈদের মাস অর্থাৎ রামাযান ও যুলহিজ্জাহ (সাধারণতঃ) একসাথে কম হয় না' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৯৭২)*। অর্থাৎ একটি ২৯ দিনে হ'লে অপরটি ৩০ দিনে হয়ে থাকে। দু'টিই ২৯ দিনে হয় না।

এক্ষণে অঞ্চল বলতে কতটুক দূরত্বের অঞ্চল বুঝায়? এ বিষয়ে আহমাদ, মুসলিম, তিরমিযী, আবুদাঊদ, নাসাঈ প্রভৃতি হাদীছগ্রন্থে কুরাইব (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে এসেছে যে, তিনি সিরিয়ায় রামাযানের ছিয়াম রেখে মাস শেষে মদীনায় ফিরে এখানকার ছিয়ামের সাথে এক দিন কমবেশ দেখতে পান। এ বিষয়ে ইবনু আব্বাস (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন যে, সিরিয়ায় আমীর মু'আবিয়া (রাঃ)-এর গৃহীত ছিয়ামের তারিখ মদীনায় প্রযোজ্য নয়। কেননা ওখানে তোমরা শুক্রবার সন্ধ্যায় চাঁদ দেখেছ। আর আমরা এখানে শনিবার সন্ধ্যায় চাঁদ দেখেছি। অতএব আমরা ছিয়াম চালিয়ে যাব, যতক্ষণ না ঈদের চাঁদ দেখতে পাব'। অন্য বর্ণনায় এসেছে, আমরা ৩০ দিন পূর্ণ করব। তাঁকে বলা হ'লঃ মু'আবিয়ার চাঁদ দেখা ও ছিয়াম রাখা কি আপনার জন্য যথেষ্ট নয়? তিনি বললেন, না। এভাবেই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদেরকে নির্দেশ দান করেছেন' *(ছহীহ তিরমিযী হা/৫৫৯; ছহীহ আবুদাঊদ হা/২০৪৪)*। ইমাম নববী বলেন, এ হাদীছ স্পষ্ট প্রমাণ করে যে, এক শহরের চন্দ্র দর্শন অন্য শহরে প্রযোজ্য নয় অধিক দূরত্বের কারণে' *(মির'আত ৬/৪২৮ হা/১৯৮৯-এর ব্যাখ্যা)*।

উল্লেখ্য যে, সিরিয়া মদীনা থেকে উত্তর-পশ্চিমে এক মাসের পথ এবং ৭০০ মাইলের মত দূরত্বে অবস্থিত। সময়ের পার্থক্য ১৪ মিঃ ৪০ সেকেণ্ড। সম্ভবতঃ সেকারণেই সেখানে মদীনার একদিন পূর্বে চাঁদ দেখা গিয়েছিল। মিশকাতের ভাষ্যকার ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী (১৩২২-১৪১৪হিঃ/ ১৯০৪-১৯৯৪খৃঃ) বলেন, পশ্চিম দিগন্তে ভূপৃষ্ঠ থেকে নবচন্দ্রের উদয়কালের উচ্চতার আধুনিক হিসাব মতে পশ্চিম অঞ্চলে চাঁদ দেখা গেলে পশ্চিমাঞ্চলসহ সেখান থেকে অন্যূন ৫৬০ মাইল দূরত্বে পূর্ব অঞ্চলের অধিবাসীদের জন্য ঐ চাঁদ গণ্য হবে। আর যদি পূর্ব অঞ্চলে চাঁদ দেখা যায়, তাহ'লে পশ্চিম অঞ্চলের সকল দূরত্বের অধিবাসীদের জন্য উক্ত চাঁদ গণ্য হবে' *(মির'আত ৬/৪২৯, হা/১৯৮৯-এর ব্যাখ্যা)*। সর্বাধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের উক্ত হিসাব মতে মক্কা শরীফে চাঁদ দেখা গেলে পূর্ব অঞ্চলের দেশ সমূহে ৫৬০ মাইল পর্যন্ত উক্ত চাঁদ দেখা যাওয়া সম্ভব এবং উক্ত দূরত্বের অধিবাসীগণ উক্ত চাঁদের

হিসাবে ছিয়াম ও ঈদ পালন করতে পারেন। উল্লেখ্য যে, এই মাইলের হিসাব সরাসরি আকাশ পথের মাইল, সড়ক পথের মাইল নয়।

উক্ত হিসাব অনুযায়ী মক্কার নিকটবর্তী ও পূর্বদিকের ৫৬০ মাইল দূরত্বের বাইরের অধিবাসীদের জন্য মক্কার চাঁদ প্রযোজ্য নয়। তারা স্ব স্ব এলাকায় চাঁদ দেখে ছিয়াম ও ঈদ পালন করবেন। পুরা বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গ ও আসাম সহ পার্শ্ববর্তী অঞ্চল সমূহে উপরোক্ত দূরত্বের হিসাবে একই চাঁদে ছিয়াম ও ঈদ পালন করা যেতে পারে। তবে ভারত বিশাল আয়তনের দেশ হওয়ায় পূর্বের কলিকাতার চাঁদ পশ্চিমের নয়াদিল্লীতে প্রযোজ্য হবে না। অনুরূপভাবে পাকিস্তানের চাঁদ বাংলাদেশে প্রযোজ্য হবে না। কারণ কা'বা শরীফ হ'তে ইসলামাবাদের দ্রাঘিমার দূরত্ব ৩২°৫৬ (বত্রিশ ডিগ্রী ছাপান্ন মিনিট), নয়াদিল্লীর ৩৬°৪৬, কলিকাতা ৪৮°৯ এবং ঢাকার দূরত্ব ৫০° ১২। সময়ের পার্থক্য যথাক্রমে ইসলামাবাদে ২ ঘঃ ১১ মিঃ ৪৪ সেকেণ্ড; নয়াদিল্লীতে ২ ঘঃ ২৭ মিঃ ৪ সেঃ; কলিকাতায় ৩ ঘঃ ১২ মিঃ ৩৬ সেঃ এবং ঢাকায় ৩ ঘঃ ২০ মিঃ ৪৮ সেকেণ্ড।

একই অঞ্চলের এক বা দু'জন মুমিন ব্যক্তি চাঁদ দেখলে তা সবার জন্য প্রযোজ্য হবে। ফলে কেউ ঢাকায় চাঁদ দেখলে আর রাজশাহীতে না দেখলে চাঁদ গণ্য করবেন না, আবার কেউ মক্কার দেখা চাঁদ অনুযায়ী বাংলাদেশে এক বা দু'দিন আগে চাঁদ গণ্য করবেন, এগুলি ঠিক নয়। কেননা হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُوْمُوْنَ وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُوْنَ وَالْأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّوْنَ 'ছাওম হ'ল যেদিন তোমরা ছিয়াম রাখো, ঈদুল ফিৎর হ'ল যেদিন তোমরা সেটা পালন কর এবং ঈদুল আযহা হ'ল যেদিন তোমরা তা পালন কর' *(আবুদাঊদ, তিরমিযী, সনদ ছহীহ, ইরওয়া হা/৯০৫, ৪/১১ পৃঃ)*। অত্র হাদীছে ইঙ্গিত রয়েছে এক অঞ্চলের অধিবাসী সকলে একই দিনে ছিয়াম ও ঈদ পালনের প্রতি। অতএব কোন বিদেশী যদি বাংলাদেশে থাকেন এবং কোন বাংলাদেশী যদি বিদেশে থাকেন, তাহ'লে সেদেশের মুসলমানদের সাথেই তিনি ছিয়াম ও ঈদ পালন করবেন, নিজ দেশের হিসাবে নয়।

সূর্য পূর্ব থেকে পশ্চিমে যায় এবং চন্দ্র পশ্চিম থেকে পূর্বে যায়। এক্ষণে কা'বা শরীফ ঢাকা থেকে পশ্চিমে হওয়ায় সেখানে চাঁদ আগে দেখা যায়। মক্কায় চাঁদ দেখার ৩ ঘঃ ২০ মিঃ ৪৮ সেকেণ্ড পরে ঢাকায় চাঁদ দেখা সম্ভব। কিন্তু ঢাকায় তখন রাত থাকায় পরের দিন সন্ধ্যায় সেটা আমরা দেখি। যদিও সরকারী হিসাবে 'প্রমাণ সময়' (Standard time) ৩ ঘন্টা ধরা হয়। যেমন রাজশাহী ও মুর্শিদাবাদ পদ্মা নদীর এপার-ওপার। সূর্যাস্তের সময়ের পার্থক্য অতি সামান্য হ'লেও সরকারী 'প্রমাণ সময়' হ'ল ৩০ মিনিট। ফলে মক্কায় যখন মাগরিবের আযান হয়, ঢাকার মুছল্লীগণ তখন এশার ছালাত আদায়ের পর রাতের খানাপিনা শেষ করেন। অনুরূপভাবে ঢাকায় যখন মাগরিব হয়, কানাডা, আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়ায় তখন ফজরের সময় হয়। এদেশে যখন রাত, ঐসব দেশে তখন দিন। এদেশে যখন শবে ক্বদর, ঐসব দেশে তখন যোহরের ছালাতের সময়। অতএব সারা বিশ্বে একই সময়ে চাঁদ দেখা ও একই দিনে ছিয়াম, শবেক্বদর ও ঈদ পালন করা সম্ভব নয়। যাঁরা এটা করতে চান, তারা সূর্যের হিসাবে করতে পারেন। কিন্তু ইসলাম উক্ত ইবাদতগুলিকে চন্দ্রের সাথে সম্পৃক্ত করেছে। অতএব মূলনীতি পরিবর্তন করা সম্ভব নয়।

এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, রামাযান, হজ্জ, ঈদায়েন প্রভৃতি ইবাদতের হিসাব আল্লাহপাক চান্দ্র মাসের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন, সৌর হিসাবে করেননি। যাতে পৃথিবীর সকল প্রান্তের মুসলমানের জন্য সকল ঋতুতে এগুলি পালনের সুযোগ হয়। অন্যথায় কোন দেশে কেবল গ্রীষ্মকালেই রামাযান আসত, আবার কোন দেশে হয়ত কেবল শীতকালেই আসত। এতে নির্দিষ্ট এলাকার মুমিনদের উপরে অবিচার করা হ'ত। কেননা চান্দ্রমাস সৌরমাসের চেয়ে ছোট এবং প্রতি বছর ১১ দিন করে এগিয়ে আসে। ইসলাম বিশ্বধর্ম। তাই বিশ্বের সকল এলাকার সকল নর-নারীর প্রতি সুবিচার করার জন্য উপরোক্ত ইবাদতগুলির সময়কালকে আল্লাহ চান্দ্র মাসের সাথে যুক্ত করেছেন। পক্ষান্তরে ছালাতের দৈনন্দিন সময়কালকে সূর্যের সাথে হিসাব করা হয়েছে। অতএব চাঁদের হিসাবে সারা বিশ্বে একইদিনে ছিয়াম ও ঈদ পালন করা প্রকারান্তরে আল্লাহ্‌র উক্ত কল্যাণ বিধান থেকে মাহরূম হওয়ার শামিল।

উল্লেখ করা আবশ্যক যে, হজ্জ ও আরাফাহ মক্কা শরীফের হিসাবেই হবে এবং হাদীছে যেহেতু 'ইয়াউমু আরাফাতা' শব্দ এসেছে, সেকারণ মক্কার বাইরের মুসলমানগণ আরাফার দিনেই নফল ছিয়াম পালন করবেন।

সঊদী আরবের সাবেক প্রধান মুফতী শায়খ আবদুল আযীয বিন আবদুল্লাহ বিন বায (১৩৩০-১৪২০হিঃ/ ১৯১৩-১৯৯৯খৃঃ) এবং দ্বিতীয় মুফতী শায়খ মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন (১৩৪৭-১৪২১হিঃ/১৯২৭-২০০১ খৃঃ) উপরোক্ত মর্মে ফৎওয়া দিয়ে গেছেন। সেদেশের 'সর্বোচ্চ ওলামা পরিষদ'ও একই মত পোষণ করেন *(দ্রঃ মজমূ' ফাতাওয়া ইবনে বায ৫/১৬০-১৭৯; আল-উছায়মীন, ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম প্রশ্নোত্তর নং ৩৯৩-৩৯৪, পৃঃ ৪৫১-৪৫৪)*।

জানিনা ১৯৮৬ খৃষ্টাব্দে জর্ডানের রাজধানী আম্মানে অনুষ্ঠিত 'ইসলামী ফিক্বহ একাডেমী'-র বৈঠকে প্রস্তাব গ্রহণের সময় সঊদী আরবের উপরোক্ত শ্রেষ্ঠ মুফতীগণ উপস্থিত ছিলেন কি-না।

প্রশ্নঃ (২/১২২)ঃ আমাদের স্কুলে প্রতিদিন সকালে পতাকাকে সালাম জানানোর মধ্য দিয়ে জাতীয় সংগীত গাওয়া হয়। শিক্ষক ও ছাত্ররা সারিবদ্ধ হয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকেন আর কিছু ছাত্র সংগীত গায়। এটা শরী'আত সম্মত কি-না তা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ মাস'উদ রেযা
শিক্ষক, করমদি মাধ্যমিক বিদ্যালয়
গাংনী, মেহেরপুর।

উত্তরঃ দেশের পরিচিতি হিসাবে জাতীয় পতাকা উড্ডয়ন করা যাবে *(হুজুরাত ১৩)*। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যুদ্ধের সময় পতাকা উত্তোলন করতেন *(তিরমিযী, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৩৮৮৯; সনদ হাসান, হেদায়াতুর রুওয়াত হা/৩৮১২)*। কিন্তু জাতীয় পতাকাকে সালাম জানানো, তার সম্মানে দাঁড়িয়ে থাকা এবং তার সামনে দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন করা ইসলামী শরী'আতের পরিপন্থী। কেননা তা বিধর্মীদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ কাজ, যা মুসলমানদের জন্য অবশ্য বর্জনীয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি অন্য জাতির সাদৃশ্যপূর্ণ কাজ করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হবে অর্থাৎ হাশর-নাশর তাদের সাথেই হবে' *(আহমাদ, আবুদাঊদ, তাহক্বীক্বে মিশকাত হা/৪৩৪৭ 'পোষাক' অধ্যায়)*।

দ্বিতীয়তঃ বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত শিরক মিশ্রিত। যা মুখে বলা ও হৃদয়ে বিশ্বাস করা অমার্জনীয় গোনাহের কাজ। নিষ্পাপ বাচ্চাদের হৃদয়ে যারা এই বিশ্বাস প্রোথিত করে দিচ্ছেন, তারা আরও বেশী গোনাহগার হচ্ছেন। উক্ত গানে 'বাংলা'-কে 'মা' সম্বোধন করা হয়েছে এবং গানের মধ্যে উক্ত কল্পিত মায়ের একটি চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। যেখানে মায়ের মুখের 'মধুর হাসি', 'মুখের বাণী', মায়ের বদন, মায়ের আকাশ, মায়ের বাতাস, সবই 'বাংলা' মায়ের বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে, যা ইসলামের তাওহীদ বিশ্বাসের সম্পূর্ণ বিরোধী।

তৃতীয়তঃ এ গানটি বাংলাদেশ-এর স্বাধীন অস্তিত্বের বিরোধী। কেননা এ গানটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১খৃঃ) রচনা করেছিলেন ১৯০৫ সালে 'বঙ্গভঙ্গ' রদ করে পূর্ব ও পশ্চিম বাংলাকে একীভূত করার উদ্দেশ্যে। ঐসময় ঢাকাকে রাজধানী করে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ব বাংলা ও আসামকে একত্রিত করে একটি স্বতন্ত্র রাজ্যের মর্যাদা দেওয়ার জন্য বৃটিশ সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। হিন্দু নেতারা একে Vivisection of mother বা 'মায়ের অঙ্গচ্ছেদ' বলে অভিহিত করেন এবং উক্ত সিদ্ধান্তের প্রতিবাদেই উক্ত গান রচিত হয়। ফলে হিন্দুদের ব্যাপক আন্দোলনের মুখে বৃটিশ সরকার ১৯১১ সালের ১২ই ডিসেম্বর 'বঙ্গভঙ্গ' রদ করতে বাধ্য হয় ও উভয় বাংলা পুনরায় এক হয়ে যায়। পরবর্তীতে ১৯৪৭ সালে পূর্ব বাংলা স্বাধীন পাকিস্তানের অংশ হিসাবে 'পূর্ব পাকিস্তান' রূপে পৃথক প্রাদেশিক মর্যাদা পায় এবং উক্ত মানচিত্রের উপরেই ১৯৭১ সালে স্বাধীন 'বাংলাদেশ' প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এ গান তাই বাংলাদেশকে পশ্চিম বঙ্গের সাথে মিলে গিয়ে ভারতের অঙ্গরাজ্যে পরিণত হবার আহ্বান জানায়। যা কোন সত্যিকারের দেশপ্রেমিক মেনে নিতে পারে না। ইসলাম তার অনুসারীদেরকে তাদের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা রক্ষার জন্য জানমাল কুরবানী দিতে উদ্বুদ্ধ করে *(আনফাল ৬০)*।

প্রশ্নঃ (৩/১২৩)ঃ ইমামের পিছনে জামা'আতে ছালাত আদায়ের সময় তিন রাক'আত হয়ে গেলে অথবা শেষ বৈঠকে মুক্তাদী জামা'আতে শরীক হ'লে বাকি রাক'আতগুলিতে শুধু সূরা ফাতিহা পড়বে, না এক বা দুই রাক'আতে সূরা ফাতিহা সহ অন্য সূরা মিলাবে। কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে সঠিক উত্তরদানে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ ইদ্রীস আলী
মুজগুন্নি, মণিরামপুর, যশোর।

উত্তরঃ ইমামের সাথে ছালাতের কিছু অংশ পেলে তাকে 'মাসবূক্ব' বলে। যদি কেউ ৪ রাক'আত বিশিষ্ট ছালাতের এক রাক'আত ইমামের সাথে পায় তবে সেটি তার প্রথম রাক'আত হিসাবে গণ্য হবে। সে পরের রাক'আতে সূরা ফাতিহা ও অন্য একটি সূরা পড়ে তাশাহহুদ পড়বে এবং শেষের দুই রাক'আতে শুধু সূরা ফাতিহা পড়ে সালাম ফিরাবে। আর যদি তিন রাক'আত বিশিষ্ট ছালাতে অর্থাৎ মাগরিব ১ রাক'আত ইমামের সাথে পায়, তবে পরের রাক'আতে সূরা ফাতিহা ও অন্য একটি সূরা পড়ে তাশাহহুদ পড়বে। তৃতীয় রাক'আতে শুধু সূরা ফাতিহা পড়বে। বায়হাক্বী হযরত আলী (রাঃ) ও ইবনে ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন, 'তুমি ইমামের সাথে যতটুকু পাবে সেটিই তোমার প্রথম ছালাত বলে গণ্য হবে'। সনদ 'জাইয়িদ' বা 'উত্তম' *(মির'আতুল মাফাতীহ ২/৩৯০ হা/৬৯১-এর ভাষ্য, বায়হাক্বী আস-সুনানুল কুবরা ২/৪২৪পৃঃ, হা/৩৬৩১)*।

প্রশ্নঃ (৪/১২৪)ঃ রামাযান মাসে ই'তেকাফ অবস্থায় এবং অন্য সময় মসজিদের বারান্দায় রেডিওর খবর শুনা এবং খবরের কাগজ পড়া যাবে কি-না?

-মুহাম্মাদ খাজির উদ্দীন
নোনাগ্রাম (দহপাড়া), বিরল, দিনাজপুর।

উত্তরঃ ই'তেকাফ অবস্থায় হৌক বা ই'তেকাফ বিহীন অবস্থায় হৌক যে সমস্ত পত্রিকা অশ্লীলতা থেকে মুক্ত, সে সমস্ত পত্রিকা মসজিদের বারান্দায় পড়া যায়। যেমন বিভিন্ন ইসলামী পত্রিকা সমূহ। আর যেহেতু রেডিওতে ভালো-মন্দ উভয়টাই শোনানো হয়, সেহেতু মসজিদে রেডিও শোনা থেকে বিরত থাকা কর্তব্য।

প্রশ্নঃ (৫/১২৫)ঃ মানুষের মৃত্যু হওয়ার আগে এবং পরে তার শিয়রে বসে কুরআন পড়া যাবে কি? জনৈক আলেম আবুদাঊদ শরীফের উদ্ধৃতি দিয়ে মা'ক্বিল ইবনু ইয়াসার বর্ণিত হাদীছ অনুযায়ী উক্ত অবস্থায় কুরআন পাঠ করার অনুমতি প্রদান করেন। সঠিক উত্তর জানতে চাই।

-মুহাম্মাদ আব্দুল লতীফ
রাজপুর, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ প্রশ্নে উল্লেখিত হাদীছটি ضعيف বা দুর্বল হওয়ার কারণে তার প্রতি আমল করা ঠিক নয় *(তাহক্বীক্বে মেশকাত*

হা/১৬২২)। পক্ষান্তরে আবু সাঈদ এবং আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের মুমূর্ষু ব্যক্তিকে কালেমা لا إله إلا الله -এর তালক্বীন দান কর' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৬১৬, মুমূর্ষু ব্যক্তির নিকট যা বলতে হয় তার অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৬/১২৬)ঃ আমি একজন মুসলিম। সাধ্যানুযায়ী ইসলাম পালন করি। কিন্তু দুঃখের বিষয় হ'ল, আমি হিন্দু বসতির মাঝে বসবাস করি। কিন্তু তাদের সাথে আমার সম্পর্ক নেই। তবে আমার অপারগতার কারণে একটি হিন্দু মহিলাকে পারিশ্রমিক দিয়ে গাভীর দুধ দোহন করে নেই। এটা বৈধ হবে কি?

-আলহাজ্জ মুহাম্মাদ আকবর হোসায়েন
মুহারাপুর, তালুক কানুপুর
গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ হিন্দু মহিলাকে পারিশ্রমিক দিয়ে বাড়ির কাজের জন্য রাখা যাবে এবং তার হাতের রান্নাও খাওয়া যাবে। ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল (রহঃ) বলেন, 'মহিলা মজুর হ'লে (চাই সে মুসলিম হোক অথবা কাফির হোক) শর্ত হ'ল যে, ফিৎনা থেকে বেঁচে থাকতে হবে এবং নিষিদ্ধ বস্তুর দিকে দৃষ্টি দেওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে' *(আল-মাউসূআ'তুল ফিক্বহিইয়াহ ১/২৮৮)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদা এক মুশরিক মহিলার মশক থেকে পানি পান করেছিলেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৮৮৪; আত-তাহরীক নভেম্বর ২০০০ প্রশ্নোত্তর ৬/৪১)*।

মাওলানা আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌভী বলেন, 'অমুসলিম (كافرة) মহিলাকে চাকরানী রাখা জায়েয' *(আব্দুল হাই, মাজমূ'আহ ফাতাওয়া, পৃঃ ৩০৮, প্রশ্নোত্তর নং ৫০২)*।

প্রশ্নঃ (৭/১২৭)ঃ খাস জমিতে মসজিদ নির্মাণ এবং দোকানপাট করে ব্যবসা করা বৈধ হবে কি?

-রূহুল আমীন
প্রভাষক
প্রেমতলী ডিগ্রী কলেজ, রাজশাহী।

উত্তরঃ মসজিদের জন্য মালিকের পক্ষ থেকে জমি ওয়াকফ হওয়া যরূরী। তবে খাস জমিতে সরকারী বাধা-নিষেধ না থাকলে সেখানে মসজিদ নির্মাণ করে ছালাত আদায় করা জায়েয হবে। তেমনি মানুষের চলাচলে অসুবিধা না হ'লে, রাস্তার পার্শ্বে মসজিদ নির্মাণ করা জায়েয হবে *(ফাতাওয়া রাশীদিয়া, পৃঃ ৫৩১)*। আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌভী বলেন, 'প্রশস্ত রাস্তার কিছু অংশে মসজিদ নির্মাণ করলে, তাতে কোন শারঈ বাধা নেই' *(ফাতাওয়া আবদুল হাই, ২৭০ পৃঃ)*। খাস জমিতে দোকানপাট তৈরী করে ব্যবসা করা অতক্ষণ বৈধ হবে, যতক্ষণ সরকার তাতে বাধা না দিবে। কেননা জমিকে অনাবাদী ফেলে রাখতে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) নিষেধ করেছেন *(বুখারী- মর্মার্থ, মিশকাত হা/২৯৯১-৯২ 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায় 'অনাবাদী জমি আবাদ করা' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৮/১২৮)ঃ সেচ ও বৃষ্টির পানির মাধ্যমে উৎপাদিত ফসলের ওশর কিভাবে বের করতে হবে?

-মাওলানা গোলাম রহমান বিশ্বাস
বাঁটরা, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ শুধু বৃষ্টি, বন্যা বা নালার পানিতে ফসল উৎপন্ন হ'লে ১০ ভাগের এক ভাগ ওশর দিতে হয়। যেহেতু কিছু সেচের পানির মাধ্যমে জমিতে ফসল উৎপাদিত হয়েছে, সেহেতু সেচের পানির হুকুম প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ ২০ ভাগের এক ভাগ ওশর দিতে হবে।

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যে শস্য আকাশের পানি বা বন্যা কিংবা নালার পানির মাধ্যমে উৎপন্ন হবে তাতে ১০ ভাগের এক ভাগ এবং যে শস্য সেচের মাধ্যমে হয়, তাতে বিশ ভাগের এক ভাগ (নিছফে ওশর) দিতে হবে' *(বুখারী, মিশকাত হা/১৭৯৭ 'যাকাত' অধ্যায়)*। ওশর ও নিছফে ওশর উভয় হাদীছের মর্ম অনুযায়ী ইমাম শওকানী (রহঃ) বলেন, যে শস্য চাষে অধিক খরচ হয় না, সেখানে দশ ভাগের একভাগ এবং যে শস্য চাষের খরচ অধিক, সেখানে বিশ ভাগের এক ভাগ ওশর দিতে হবে'। ইমাম নববী বলেন, 'এ বিষয়ে বিদ্বানগণ সকলে একমত' *(নায়লুল আওত্বার ৫/১৮১ পৃঃ 'ফসল ও ফলের যাকাত' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৯/১২৯)ঃ মহিষ কুরবানী দেওয়া যাবে কি? পরিবারের সদস্য সংখ্যা অনেক হ'লে এবং কুরবানীর গোশতে যদি সকলের একবার খাওয়ার মত হয়, তাহ'লে কি ফকীর-মিসকীনকে গোশত দিতে হবে?

-আবুল কালাম আযাদ
উপযেলা কৃষি অফিস, কুমারখালী, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ সূরা হজ্জের ৩৪ ও ৩৬ নং আয়াতে البدن ও الأنعام শব্দ উল্লেখিত রয়েছে, যা উট, গরু বা গরু জাতীয় পশুকে বুঝায়। আর মহিষ ও গরু যে একই জাতীয় পশু এ ব্যাপারে সকল বিদ্বান একমত। কাজেই মহিষের গোশত খাওয়াতে ও তা কুরবানী দেওয়াতে কোন দোষ নেই। হাসান (রাঃ) বলেন, 'মহিষ গরুর স্থলাভিষিক্ত' *(মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বা; মির'আত ৫/৮১ 'কুরবানী' অনুচ্ছেদ, দ্রষ্টব্যঃ জানুয়ারী ২০০৩, প্রশ্নোত্তর ১২/১১৭)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'তোমরা (কুরবানীর গোশত) খাও, জমা রাখ এবং ছাদাক্বাহ কর' *(মুসলিম, ইরওয়া হা/১১৫৬, ৪/৩৭০ পৃঃ)*। উক্ত নির্দেশ অনুযায়ী কুরবানীর গোশত তিনভাগ করা উত্তম। যার এক ভাগ ঐসকল মিসকীনকে দেওয়া উচিত, যারা কুরবানী দিতে পারেননি *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ২/৩১ 'কুরবানীর গোশত বন্টন' অনুচ্ছেদ; দ্রঃ মাসায়েলে কুরবানী পৃঃ ১০)*।

প্রশ্নঃ (১০/১৩০)ঃ কুরবানীর দিন দুপুর পর্যন্ত নাকি ছিয়াম রাখতে হয়? এর সত্যতা জানতে চাই।

-ইবরাহীম

দিয়াড় মানিক চক, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ কুরবানীদাতার জন্য ঈদের দিন কুরবানীর গোশত খাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত না খেয়ে থাকা সুন্নাত। এর নাম ছিয়াম নয়। বুরায়দা (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈদুল ফিৎর-এর দিন না খেয়ে ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বের হ'তেন না। আর ঈদুল আযহার দিন ছালাত শেষ না করে খেতেন না' *(তিরমিযী, ইবনু মাজাহ ও দারেমী, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/১৪৪০, 'দুই ঈদের ছালাত' অনুচ্ছেদ)*। কুরবানীর পশুর কলিজা দ্বারা ইফতার করা সুন্নাত *(বায়হাক্বী, মির'আত ২/৩৩৮ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (১১/১৩১)ঃ ওযূর অঙ্গের ক্ষত স্থানে পট্টি লাগান থাকলে, কিভাবে ওযূ করতে হবে?

-রেযাউল করীম
রেলবাজার, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তরঃ আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তির ক্ষতস্থানে পট্টি আছে, সে ওযূ করবে ও পট্টির উপরে মাসাহ করবে। আর পট্টির আশ-পাশে ধৌত করবে' *(বায়হাক্বী, হাদীছ ছহীহ, মির'আত হা/৫৩৩-এর ব্যাখ্যা, 'পট্টির উপর মাসাহ করা' অনুচ্ছেদ; দ্রঃ অক্টোবর ২০০২, প্রশ্নোত্তর ২০/২০)*।

প্রশ্নঃ (১২/১৩২)ঃ কুরবানীর গোশত কত দিন পর্যন্ত রেখে খাওয়া যাবে? কুরবানীর গোশত ৮ ভাগ করে ৭ ভাগ নিজে রেখে একভাগ সমাজে বিতরণ করা বৈধ হবে কি?

-আব্দুল জব্বার
গাবতলী, বগুড়া
ও
আব্দুল্লাহ
মথুরা, নওহাটা, রাজশাহী।

উত্তরঃ গরীব-মিসকীনকে কুরবানীর গোশত দেওয়ার পর যতদিন ইচ্ছা রেখে খাওয়া যাবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, كُلُوْا وَادَّخِرُوْا وَتَصَدَّقُوْا 'তোমরা (কুরবানীর গোশত) খাও, জমা রাখ এবং ছাদাক্বাহ কর' *(মুসলিম, ছহীহ নাসাঈ হা/৪৪৪৩, 'কুরবানীর গোশত জমা রাখা' অনুচ্ছেদ; ইরওয়া হা/১১৫৬, ৪/৩৬৯-৭০ পৃঃ; ছহীহ আবুদাঊদ হা/২৫০৩)*। উল্লেখিত হাদীছ দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, কুরবানীর গোশত জমা রাখার নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করা হয়নি। সুতরাং যতদিন ইচ্ছা জমা রেখে কুরবানীর গোশত খেতে পারবে। কুরবানীর গোশত ৮ ভাগ করার কোন ইঙ্গিত হাদীছে পাওয়া যায় না। অতএব উক্ত নিয়ম বাতিলযোগ্য।

প্রশ্নঃ (১৩/১৩৩)ঃ কুরবানীর পশু নিজে যবেহ করবে, না অন্যের মাধ্যমে যবেহ করবে? কুরবানীর পশুর মাথাগুলি যবেহকারী ইমাম ছাহেব নিয়ে নেন। এটা কি ঠিক?

-মুহাম্মাদ শু'আইব আলী
দুবইল, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তরঃ কুরবানীর পশু নিজ হাতে যবেহ করা সুন্নাত *(ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/২৫৭১)*। তবে অন্যের মাধ্যমেও যবেহ করা যায়। জাবির ইবনু আবদিল্লাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কিছু উট নিজ হাতে যবেহ করলেন এবং কিছু উট অন্যের মাধ্যমে যবেহ করলেন *(ছহীহ নাসাঈ হা/৪৪৩১; দ্রষ্টব্য অক্টোবর ২০০১ প্রশ্নোত্তর ৪/৪)*। যবহের পারিশ্রমিক হিসাবে ইমাম ছাহেবকে টাকা দিতে হবে। কুরবানীর গোশত বা মাথা দেওয়া যাবে না *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ২/৩৯ পৃঃ, 'কুরবানীর গোশত বণ্টন' অনুচ্ছেদ)*। তবে ঐ ব্যক্তি দরিদ্র হ'লে হাদিয়া স্বরূপ তাকে কিছু দেওয়ায় দোষ নেই *(মুগনী ১১/১১০)*।

প্রশ্নঃ (১৪/১৩৪)ঃ সামর্থ্য না থাকলেও ধার করে কুরবানী করতে হবে কি? একই পরিবারের সদস্যগণ পৃথকভাবে আয় করলে, সবাই মিলে ১টি কুরবানী করবে, না সবাইকে আলাদাভাবে কুরবানী করতে হবে?

-মুহাম্মাদ আলতাফ আলী
এ,বি, ব্যাংক, নওগাঁ
ও
হাবীবুর রহমান
সাহেব বাজার, রাজশাহী।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি কুরবানী করল না, সে যেন আমাদের ঈদগাহের নিকটবর্তী না হয়' *(ইবনু মাজাহ, নায়ল ৬/২২৭)*। অতএব সামর্থ্য থাকলেই কুরবানী করতে হবে, না থাকলে নয়। তবে ধার করে কুরবানী করতে হবে এরূপ বাধ্য-বাধকতা শরী'আতে নেই *(দ্রঃ ফেব্রুয়ারী ২০০২ প্রশ্নোত্তর ২৫/১৬৫)*।

একই পরিবার এক সাথে থাকলে পরিবারের পক্ষ থেকে একটি পশু কুরবানী করলে যথেষ্ট হবে। একাধিক কুরবানী করলেও করতে পারেন *(বিস্তারিত দেখুনঃ ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব প্রণীত মাসায়েলে কুরবানী)*।

প্রশ্নঃ (১৫/১৩৫)ঃ ঈদুল আযহার চাঁদ উঠলে সকলের জন্য নখ ও চুল কাটা নিষেধ, না শুধু কুরবানীদাতার জন্য? আর যারা কুরবানী দিতে পারে না, তারা গোশত খাওয়ার জন্য সেদিন মুরগী যবেহ করতে পারবে কি?

-আতাউর রহমান
বড়কুড়া, কামারখন্দ
সিরাজগঞ্জ
ও
আব্দুল বারী
জুমারবাড়ী, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ উম্মু সালামাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, ... 'যে ব্যক্তি যুলহিজ্জার চাঁদ দেখবে এবং কুরবানী করার ইচ্ছা করবে, সে যেন চুল ও নখ না কাটে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৪৫৯ 'কুরবানী' অনুচ্ছেদ)*। উল্লেখিত হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, কুরবানীদাতার জন্য চুল ও নখ কাটা নিষেধ। তবে অন্যের জন্য নিষেধ না হ'লেও না

কাটাই উত্তম হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জনৈক কুরবানী দিতে অক্ষম ব্যক্তির জবাবে বলেন, তুমি ঐদিন তোমার চুল, নখ, লোম কর্তন কর। সেটাই তোমার জন্য আল্লাহ্র নিকটে পূর্ণাঙ্গ কুরবানী হিসাবে গৃহীত হবে' অর্থাৎ পূর্ণ কুরবানীর নেকী পাবে। *(আবুদাঊদ, নাসাঈ, হাকেম একে ছহীহ বলেছেন। যাহাবী তাকে সমর্থণ করেছেন ৪/২২৩; মির'আত ৫/১১৭)*। আর কুরবানীর দিন শুধু নয়, যেকোন দিন হালাল পশু যবেহ করে খাওয়া যাবে। তবে কুরবানীর নিয়তে মুরগী যবহ করা যাবে না। কেননা মুরগী কুরবানীর পশুর অন্তর্ভুক্ত নয়।

প্রশ্নঃ (১৬/১৩৬)ঃ জনৈক আলেম কবরস্থানে গিয়ে সম্মিলিতভাবে হাত উঠিয়ে দো'আ করেছেন। এটা কি ঠিক?

-মুহাম্মাদ আতাউর রহমান
সারাংপুর, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তরঃ সম্মিলিতভাবে হাত উঠিয়ে দো'আ করার প্রচলিত নিয়মটি ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয়, বিধায় এটি পরিত্যাজ্য। তবে বিশেষ কোন দিন বা রাত নির্ধারণ না করে একাকী কবরস্থানে গিয়ে কবরবাসীর জন্য হাত তুলে দো'আ করা যায়।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) 'বাক্বীউল গারক্বাদ' কবরস্থানে গিয়ে কবরবাসীর উদ্দেশ্যে একাকী হাত তুলে দো'আ করেছিলেন *(মুসলিম ১/৩১৩ পৃঃ 'জানাযা' অধ্যায়, 'কবরবাসীদের সালাম ও তাদের জন্য দো'আ' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (১৭/১৩৭)ঃ ঈদগাহকে বিভিন্ন রঙিন কাগজ দ্বারা সজ্জিত করা যাবে কি? কুরবানীর পশু কেনার পর অসুখ হ'লে সেটি বিক্রি করে ভাল পশু ক্রয় করা যাবে কি?

-সুলতান মাহমূদ
মূলগ্রাম, কালাই, জয়পুরহাট
ও
আশরাফ আলী
হরিপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ বর্তমানে কোন কোন ঈদগাহ যেভাবে সুদৃশ্য গেইট নির্মাণ করে ও রঙিন কাগজ ইত্যাদি দ্বারা সুসজ্জিত করা হয়ে থাকে, তা শরী'আত সম্মত নয়। কারণ ঈদগাহ হ'ল ইবাদতের স্থান। ইবাদতের স্থানে সাজ-সজ্জা করা যাবে না। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'মসজিদ সমূহকে চাকচিক্যময় করে নির্মাণ করার জন্য আমি আদিষ্ট হইনি'। অতঃপর ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, (কিন্তু বড় দুঃখের বিষয় যে,) তোমরা উহাকে (বিভিন্নভাবে) চাকচিক্যময় করবে, যেভাবে ঈহুদী-খৃষ্টানরা করেছে' *(আবুদাঊদ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৭১৮ 'মসজিদ সমূহ ও ছালাতের স্থান সমূহ' অনুচ্ছেদ)*। তবে মসজিদকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশ রয়েছে *(আবুদাঊদ, তিরমিযী, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৭১৭, ঐ)*। অতএব ঈদগাহ ছালাতের স্থান হিসাবে তাকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। তবে বিশেষ কোন সাজ-সজ্জা নয়।

কুরবানীর পশুর অসুখ হ'লে সেটি বিক্রি করে ভাল পশু কিনে কুরবানী করতে শরী'আতে কোন বাধা নেই।

প্রশ্নঃ (১৮/১৩৮)ঃ মৃতব্যক্তির পক্ষ থেকে কুরবানী দেওয়া যাবে কি? যবহের পূর্বে কুরবানীর পশুর চামড়া বিক্রি করা যাবে কি?

-আযীযুল হক
সিতাইকুণ্ড, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ
ও
ছাদেকুল ইসলাম
নোয়াগাঁও, আড়াই হাযার, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তরঃ মৃতব্যক্তির জন্য পৃথকভাবে কুরবানী দেওয়ার কোন ছহীহ দলীল নেই। আলী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অছিয়ত হিসাবে তাঁর জন্য পৃথক একটি দুম্বা কুরবানী করেছিলেন বলে তিরমিযীতে যে হাদীছটি এসেছে *(মিশকাত হা/১৪৬২ 'কুরবানী' অনুচ্ছেদ টীকা নং ২)*, তা নিতান্তই যঈফ। অন্য কোন ছাহাবী রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জন্য বা কোন মৃতব্যক্তির জন্য এভাবে কুরবানী করেছেন বলে জানা যায় না। আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (১১৮-১৮১হিঃ) বলেন, 'যদি কেউ (মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে) কুরবানী করেই বসে তবে সবটুকু ছাদাক্বাহ করে দিতে হবে' *(তিরমিযী, তুহফাতুল আহওয়াযী সহ হা/১৫২৮, ৫/৭৮-৮০ পৃঃ; দ্রঃ মাসায়েলে কুরবানী পৃঃ ১০; ডিসেম্বর ২০০১ প্রশ্নোত্তর ১৬/৮৬)*। উল্লেখ্য যে, যবহের পূর্বে কুরবানীর পশুর চামড়া বিক্রি করাতে কোন বাধা নেই।

প্রশ্নঃ (১৯/১৩৯)ঃ ইমাম ছাহেব কর্তৃক ঈদের তাকবীর ভুলবশতঃ কমবেশী হয়ে গেলে সহো সিজদা লাগবে কি?

-হাসীনুর রহমান
গোমস্তাপুর, নাচোল, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ ভুলবশতঃ ঈদের তাকবীর কমবেশী হ'লে ছালাত শুদ্ধ হয়ে যাবে এবং এর জন্য সহো সিজদা লাগবে না *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৭০ পৃঃ; 'দুই ঈদের ছালাতের তাকবীর' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (২০/১৪০)ঃ জন্ম দিবস পালন করা ও তার দাওয়াত খাওয়া যাবে কি?

-মুহাম্মাদ মুছত্বফা
কাঁঠালপাড়া, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের যুগে জন্ম ও মৃত্যুদিবস কিংবা অন্য কোনরূপ দিবস পালনের ও দাওয়াত কবুলের কোন নযীর নেই। এসব অমুসলিমদের অনুকরণে পালিত রেওয়াজ। মুসলমানদেরকে এসব থেকে দূরে থাকতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের সাদৃশ্য অবলম্বন করবে, সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে' *(আবুদাঊদ, সনদ হাসান, মিশকাত হা/৪৩৪৭ 'পোষাক' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (২১/১৪১)ঃ স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে সম্বোধন করার পদ্ধতি কি হবে? স্ত্রী কি স্বামীকে ভাই কিংবা বাবা বলে ডাকতে পারবে?

-মুহাম্মাদ মাহবূব ইসলাম
উত্তর শালিখা, মেহেরপুর।

উত্তরঃ স্বামী-স্ত্রী ছেলেমেয়ের নামের সাথে যোগ করে ডাকতে পারে। যেমন হে অমুকের আব্বা বা অমুকের আম্মা! *(আবুদাউদ, নাসাঈ, সনদ জাইয়েদ, মিশকাত হা/৪৭৬৬ 'শিষ্টাচার' অধ্যায়, 'নাম রাখা' অনুচ্ছেদ)*। স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের নাম ধরেও ডাকতে পারে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আয়েশা (রাঃ)-কে নাম ধরে ডাকতেন *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৬১৬৭)*। ইবরাহীম (আঃ)-কে তাঁর স্ত্রী নাম ধরে ডেকেছিলেন *(বুখারী ১/৪৭৪)*। মুমিনগণ পরস্পর ভাই ভাই (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ إِخْوَةٌ)। সে হিসাবে স্ত্রী যদি স্বামীকে ভাই বলে ডাকে তবে তাতে কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু বর্তমানে কেউ কেউ স্বামীকে 'বাবা' বলে সম্বোধন করে থাকে এটি কবীরা গোনাহ। কারণ বাবা অর্থ পিতা, যা স্ত্রী কোন অবস্থাতেই তার স্বামীকে বলতে পারে না।

প্রশ্নঃ (২২/১৪২)ঃ কোন কোন বন্ধ্যা মহিলা পর পুরুষের বীর্য গ্রহণ করে সন্তানের মা হচ্ছে। এটা কি জায়েয।

-মুহাম্মাদ রফীকুল হক
ঘোনা, সাতক্ষীরা
ও
মিসেস সালমা
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ কোন নারী অপর কোন পুরুষের বীর্য গর্ভে ধারণ করতে পারে না। কারণ এটা স্পষ্ট যেনা। দ্বিতীয়তঃ এর ফলে সন্তানের কোন বংশ পরিচয় থাকে না। অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আমি মানব সমাজের মধ্যে বংশ ও গোত্র করে সৃষ্টি করেছি, যেন তোমরা পরস্পরে পরিচিত হ'তে পার' *(হুজুরাত ১৩)*। তৃতীয়তঃ বন্ধ্যা হওয়া না হওয়া এটি সম্পূর্ণ আল্লাহ্র এখতিয়ারে। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন, যাকে ইচ্ছা কন্যা এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন। অথবা তাদের পুত্র ও কন্যা উভয় দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা করে রাখেন' *(শূরা ৪৯-৫০; দ্রঃ মার্চ ২০০৩ প্রশ্নোত্তর ৪০/২২৫)*।

প্রশ্নঃ (২৩/১৪৩)ঃ 'তাকবীরে তাহরীমা'র পর ছানা পড়ার সময় اللهم باعد بينى الخ পাঠ করা উত্তম হবে, না سبحانك اللهم وبحمدك এ দো'আ পড়া উত্তম হবে?

-আব্দুর রহমান
জয়ন্তীবাড়ী, বগুড়া।

উত্তরঃ 'বায়েদ বায়নী' হাদীছটি বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত এবং এর মধ্যে বান্দার প্রার্থনা বর্ণিত হয়েছে *(মিশকাত হা/৮১২)*। সে হিসাবে সনদ ও প্রার্থনার বিবেচনায় 'বায়েদ বায়নী' পড়া উত্তম হবে। 'সুবহানাকা আল্লাহুম্মা' তিরমিযী ও আবুদাউদে বর্ণিত *(মিশকাত হা/৮১৫)* এবং এর সনদ সম্পর্কে ইমাম তিরমিযী ও ইমাম বুখারী দুর্বল হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করেছেন। তবে অন্যান্য সূত্রের বিবেচনায় শায়খ আলবানী হাদীছটিকে 'ছহীহ' বলেছেন *(মিশকাত হা/৮১৫-এর টীকা; মির'আত হা/৮২১, ৩/৯৪)*। 'বায়েদ বায়নী'-র হাদীছটি সনদের দিক দিয়ে أصح বা বিশুদ্ধতম। তাছাড়া আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) সর্বদা এটির উপরে আমল করতেন বলে হাদীছের বর্ণনায় ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

প্রশ্নঃ (২৪/১৪৪)ঃ আমি মুসলমানের ঘরে জন্ম নিলেও আমার দ্বারা যেসব কথা ও কর্ম ঘটেছে তাতে ঈমান নষ্ট হয়ে যায় এবং মানুষ কাফের হয়ে যায়। এখন আমার করণীয় কি? শুধু তওবা করলে হবে, না পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করতে হবে?

-আব্দুর রশীদ
দিনাজপুর।

উত্তরঃ আপনি যদি আপনার কথা ও কর্ম দ্বারা নিজেকে 'কাফির' বলে মনে করেন, তাহ'লে আপনি একজন মুত্তাক্বী ও সুন্নাতপন্থী আলেমের নিকটে গিয়ে তওবা করে ইসলাম গ্রহণ করুন *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৮)*। আর যদি 'গোনাহে কবীরা' করেছেন বলে মনে করেন, তাহ'লে নিজে নিজে অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহ্র নিকটে তওবা করুন ও ক্ষমা প্রার্থনা করুন *(যুমার ৫৩)*।

প্রশ্নঃ (২৫/১৪৫)ঃ মানুষ মারা যাওয়ার পর সাধারণতঃ মাথা উত্তর দিকে ও পা দক্ষিণ দিকে রেখে কাপড় দ্বারা ঢেকে রাখা হয়। কিন্তু জনৈক আলেম মৃতকে কিবলামুখী রাখতে গিয়ে পা পশ্চিম দিকে রেখে কয়েকটি বালিশে হেলান দিয়ে কিবলামুখী রাখার কথা বলেন। এ বিষয়ে সঠিক সমাধান জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আলহাজ্জ আব্দুর রহমান
রাজপুর, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ মৃত ব্যক্তিকে দাফনের পূর্বে কিবলামুখী করে রাখা বা না রাখা উভয়ই জায়েয। জাবির বলেন, আমি শা'বীকে জিজ্ঞেস করলাম মৃত ব্যক্তিকে কিবলামুখী করে রাখা সম্পর্কে। তিনি বললেন, ইচ্ছা করলে তাকে কিবলামুখী করে রাখতে পার বা নাও পার *(ইবনু হাযম আন্দালুসী, মুহাল্লা, ৩/৪০৫ পৃঃ মাসআলা নং ৬১৬; দ্রষ্টব্যঃ ছালাতুর রাসূল পৃঃ ১১৯)*।

প্রশ্নঃ (২৬/১৪৬)ঃ কবর খনন করলে কি নেকী হয়? আমাদের দেশে একটি কথা প্রচলিত আছে, যে ১০০টি কবর খনন করবে সে বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবে। কথাটির সত্যতা জানতে চাই।

-মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন
বাউসা, বাঘা, রাজশাহী।

উত্তরঃ উল্লেখিত কথাটি ভিত্তিহীন। তবে কবর খনন করা

নিঃসন্দেহে নেকীর কাজ। এজন্য ঐ ব্যক্তি অশেষ ছওয়াবের অধিকারী হবেন। কেননা আল্লাহ বলেন, নেকীর কাজে তোমরা পরস্পরে সহযোগিতা কর... *(মায়েদাহ ২)*।

প্রশ্নঃ (২৭/১৪৭)ঃ বন্যা কবলিত এলাকায় বিদেশী এনজিওগুলি আমাদেরকে আর্থিক সহযোগিতা দিতে চায়। আমরা এগুলো গ্রহণ করতে পারব কি?

-মুযাফফর রহমান
শান্তি ফার্মেসী
আখড়াখোলা বাজার, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ অমুসলিমদের সাহায্য-সহযোগিতা গ্রহণ করা জায়েয। আবু হুমায়েদ (রাঃ) বর্ণনা করেন, 'আয়লার শাসক নবী করীম (ছাঃ)-কে একটি সাদা খচ্চর উপহার দিয়েছিলেন। নবী (ছাঃ) তাকে একখানা চাদর হাদিয়া দিয়েছিলেন এবং সেখানকার শাসক হিসাবে তাকে সনদ লিখে দিয়েছিলেন' *(বুখারী ১/৩৫৬ 'মুশরিকদের হাদিয়া গ্রহণ করা' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (২৮/১৪৮)ঃ জনৈক মুফাসসিরে কুরআন এক তাফসীর মাহফিলে বলেন, ইস্রাফীল (আঃ) সিংঙ্গায় ফুঁক দিলে দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাবে এমন কি কুরআনও ধ্বংস হবে। কিন্তু ইস্রাফীল (আঃ)-এর কপালে আল্লাহ যে ত্রিশ পারা কুরআন লিখে দিয়েছেন তা ধ্বংস হবে না। প্রশ্ন হচ্ছে ইস্রাফীল (আঃ)-এর কপালে লিখিত কুরআনের কোন দলীল আছে কি?

-মুহাম্মাদ ফযলুর রহমান
উত্তর কাটিয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্য ভিত্তিহীন ও বানোয়াট। যার প্রমাণে কোন দলীল পাওয়া যায় না। ঐদিন লাওহে মাহফূয-এর কুরআন ব্যতীত দুনিয়ার সমস্ত লিখিত কুরআন ধ্বংস হয়ে যাবে। আল্লাহ বলেন, 'যমীনের উপরে যা কিছু আছে, সবকিছু ধ্বংস হবে। কেবলমাত্র তোমার প্রভুর চেহারা ব্যতীত' *(রহমান ২৭)*।

প্রশ্নঃ (২৯/১৪৯)ঃ আমার স্ত্রীর সাথে আমার মাঝে মাঝে ঝগড়া-বিবাদ লেগেই থাকে। আমি একদিন রাগের মাথায় আমার স্ত্রীকে বলে ফেলি যে, তুই যদি আমার গায়ে হাত দিস তাহ'লে আমি তোর বাবা। এমতাবস্থায় কি 'যিহার' সাব্যস্ত হবে?

-মুহাম্মাদ ফরহাদ মাহমূদ
শুবিরপাড়া, তানোর, রাজশাহী।

উত্তরঃ 'যিহার' কেবলমাত্র মায়ের সাথে খাছ। অর্থাৎ স্ত্রীকে মায়ের পিঠের সাথে তুলনা করা। অতএব প্রশ্নোল্লেখিত উক্তি দ্বারা যিহার সাব্যস্ত হবে না। তবে এ ধরনের অন্যায় ও অশালীন কথাবার্তা থেকে তওবা করা ও বিরত থাকা অপরিহার্য *(দ্রঃ নায়লুল আওত্বার ৮/৬০ 'যিহার' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (৩০/১৫০)ঃ মুসলমানদের দোকানঘর অমুসলিমরা ভাড়া নিয়ে সেখানে তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পালন করলে যে পাপ হবে তা কি জায়গাওয়ালার উপর বর্তাবে?

-মুহাম্মাদ আবু মূসা
পাঠানপাড়া বাজার
ক্ষেতলাল, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ গান-বাজনা সহ যেকোন অন্যায় অশ্লীল কাজের জন্য এবং অমুসলিমদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনের জন্য দোকান ভাড়া দিয়ে তাদের সেই শরী'আত বিরোধী কার্যকলাপে সহযোগিতা করা যাবে না। মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমরা সৎকর্ম ও আল্লাহভীতিতে পরস্পরে সহযোগিতা কর এবং পাপ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে সহায়তা করো না' *(মায়েদাহ ২)*। অতএব ঐসব অন্যায় কাজে দোকান ভাড়া দেওয়া থেকে বিরত থাকা কর্তব্য।

প্রশ্নঃ (৩১/১৫১)ঃ হিন্দুদের লাশ পোড়ানোর শ্মশানে মুসলমানদের কবরস্থান বানানো যাবে কি?

-শরীফুল ইসলাম
দেইলপাড়া
রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তরঃ উক্ত স্থানটি যদি হিন্দুদের মালিকানা মুক্ত হয়, তবে সেটিতে কবরস্থান বানাতে শারঈ দৃষ্টিকোন থেকে কোন নিষেধাজ্ঞা নেই। কারণ অমুসলিমদের নিকট থেকে খরিদকৃত জমির কবরস্থানের কবর উঠিয়ে ফেলার পর সেখানে মসজিদ বানানো শরী'আতে জায়েয রয়েছে *(বুখারী ১/৬১পৃঃ 'ছালাত' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (৩২/১৫২)ঃ বাগদাদে কি কবরের আযাব মাফ? আমাদের নবী করীম (ছাঃ) এবং ওয়ায়েস কুরনী কি একই যুগের মানুষ?

-ফরহাদ হোসায়েন
আমীরপুর, খুলনা।

উত্তরঃ বাগদাদে কবর আযাব মাফ নয়। এরূপ আক্বীদা পোষণ করা কুফরী। ওয়ায়েস কুরনী রাসূল (ছাঃ)-এর যুগের লোক। তবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে তার সাক্ষাত হয়নি। যার কারণে তিনি ছাহাবী নন, তাবেঈ হিসাবে গণ্য। ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে আমি বলতে শুনেছি নিশ্চয়ই তাবেঈদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তি হচ্ছে ওয়ায়েস কুরনী *(মুসলিম, মিশকাত হা/৬২৫৭)*। অন্য এক বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'ইয়ামান হ'তে তোমাদের নিকট এমন ব্যক্তি আসবে যাকে ওয়ায়েস বলা হয়' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৬২৫৭)*।

প্রশ্নঃ (৩৩/১৫৩)ঃ তাশাহহুদ অবস্থায় জামা'আতে শরীক হ'লে ইমামের সাথে তাশাহহুদ পড়তে হবে কি?

-এনামুল হক্ব
শঠিবাড়ী, মিঠাপুকুর, রংপুর।

উত্তরঃ তাশাহহুদ অবস্থায় জামা'আতে শরীক হ'লে ইমামের সাথে তাশাহহুদ ও বাকী দো'আ পড়তে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ইমাম নির্ধারণ করা হয় তার

অনুসরণ করার জন্য। কাজেই তোমরা তার বিপরীত কর না *(বুখারী, মুসলিম, ইরওয়া হা/৫৩৬)*।

প্রশ্নঃ (৩৪/১৫৪)ঃ একই ছালাত মসজিদে জামা'আতবদ্ধ ভাবে একাধিকবার অনুষ্ঠিত হ'তে পারে কি? আলবানী (রাঃ) বলেছেন পারে না।

-আতাউর রহমান
সন্ন্যাসবাড়ী, বান্দাইখাড়া, নওগাঁ।

উত্তরঃ একই ছালাত জামা'আতবদ্ধভাবে একাধিকবার অনুষ্ঠিত হ'তে পারে। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, একজন লোক মসজিদে আসল, এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছালাত আদায় করে নিয়েছেন। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন কোন ব্যক্তি এই লোককে ছাদাক্বাহ করবে কি? অর্থাৎ সে তার সাথে ছালাত আদায় করবে কি? একজন লোক দাঁড়ালো এবং তার সাথে ছালাত আদায় করল *(তিরমিযী, মিশকাত হা/১১৪৬; শাওকানী, নায়লুল আওত্বার ৪/৪৩ পৃঃ; 'ইমামের ছালাত আদায়ের পর মসজিদে জামা'আত করে ছালাত আদায় করা' অনুচ্ছেদ)*। শায়খ আলবানী মিশকাতের হাশিয়ায় (হা/১১৪৬) ও শায়খ আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির *(তিরমিযীর হাশিয়ায় হা/২২০)* ১ম জামা'আতের পরে ২য় জামা'আত শুদ্ধ হবে না বলে যে বক্তব্য রেখেছেন, তা ইজতিহাদ ভিত্তিক।

প্রশ্নঃ (৩৫/১৫৫)ঃ আমি নিজে জমি চাষ করি না, বর্গা বা ভাগে দিয়ে থাকি। এমতাবস্থায় আমি কিভাবে ওশর বের করব?

-আব্বাস আলী গাযী
সোনাতন কাটি, শার্শা, যশোর।

উত্তরঃ নিজ ভাগের ফসল থেকে ওশর বের করতে হবে, যদি তা নেছাব পরিমাণ হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আমি তোমাদের জন্য জমি হ'তে যা উৎপাদন করি, তার যাকাত বের কর' *(বাক্বারাহ ২৬৭)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 'শস্য কাটার দিন তার হক্ব আদায় কর' *(আন'আম ১৪১)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'উৎপাদিত শস্য পাঁচ ওয়াসাক্বের (প্রায় ২০ মনের) কম হ'লে যাকাত লাগবে না' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৭৯৪)*।

প্রশ্নঃ (৩৬/১৫৬)ঃ আমি হেফয খানার একজন শিক্ষক। ক্বায়দা পড়া শেষ হ'লে কুরআন শুরু করার সময় ছাত্রদের কাছ থেকে মিষ্টি খাই এবং অন্যান্যদের খাওয়াতে বলি। এটা কি ঠিক?

-আনারুল ইসলাম
চাঁদপুর, শিবগঞ্জ, চাপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ কুরআন শুরু করার সময় খাওয়া বা খেতে দেওয়ার জন্য বলার কোন শারঈ বিধান নেই। তবে এটাকে খুশীর ব্যাপার মনে করে কিছু হাদিয়ার ব্যবস্থা করতে পারে কিংবা কিছু দান করতে পারে। কা'ব ইবনে মালেক (রাঃ) তার তওবা কবুলের সুসংবাদদাতাকে খুশী হয়ে দু'টি কাপড় দিয়েছিলেন এবং অনেক অর্থ সম্পদ আল্লাহ্র রাস্তায় দান করেছিলেন *(বুখারী ২/৬৩৬ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (৩৭/১৫৭)ঃ ঘুমের কারণে ফজরের ছালাতের সময় পার হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু বিতর বাকী আছে। এমতাবস্থায় ফজরের ছালাত আদায় করব, না বিতর ছালাত আদায় করব?

-ইদ্রীস আলী
বাঁশদহা বাজার, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ এ অবস্থায় আগে ফজরের ছালাত আদায় করতে হবে, তারপর বিতর ছালাত আদায় করবে। ফজরের ছালাতের পর পরই আদায় করা যায়, সূর্যোদয়ের পরেও আদায় করা যায়। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, যখন ফজর হয়ে যাবে, তখন ফজরের দুই রাক'আত ছালাত ছাড়া আর কোন ছালাত আদায় করা যাবে না *(আহমাদ, ইরওয়া হা/৪৭৮)*। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যখন তোমাদের কারো সকাল হয়ে যাবে এমতাবস্থায় যে সে বিতর পড়েনি, সে যেন বিতর পড়ে নেয় *(বায়হাক্বী, ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১৪৮ পৃঃ 'বিতরের ক্বাযা' অনুচ্ছেদ)*। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি বিতর না পড়ে ঘুমাবে অথবা পড়তে ভুলে যাবে, সে যেন স্মরণ হওয়া মাত্র আদায় করে' *(আবুদাঊদ, ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১৪৮)*। অত্র হাদীছ দ্বয় দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বিতরের ক্বাযা আদায় করতে হবে।

প্রশ্নঃ (৩৮/১৫৮)ঃ ইয়াওমুল আরাফার ছিয়ামের ফযীলত কি? চন্দ্র মাসের কত তারিখে উক্ত ছিয়াম রাখতে হয়? এটা আমাদের দেশের চাঁদের হিসাবে রাখতে হবে? না আরব দেশের চাঁদের হিসাবে রাখতে হবে?

-মুহাম্মাদ নাজমুল হাসান
বাঁশদহা বাজার, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ আরাফার দিন ছিয়াম পালন করলে একবছর পূর্বের এবং এক বছর পরের (ছগীরা) গুনাহ মাফ করা হবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/২০৪৪)*। উক্ত ছিয়াম পালনের জন্য যেমন কোন তারিখ উল্লেখ করা হয়নি, তেমন দেশ অনুপাতে চাঁদ দেখারও হিসাব করা হয়নি। বরং বলা হয়েছে 'আরাফার দিন' ছিয়াম রাখতে। কাজেই আমাদেরকে মক্কা শরীফের হিসাবে আরাফার দিন ছিয়াম পালন করতে হবে।

প্রশ্নঃ (৩৯/১৫৯)ঃ জনৈক ছাত্র দেউবন্দ মাদরাসা হ'তে এক রূপার আংটি নিয়ে আসে এবং নিম্নলিখিত গুণের উপর বিজ্ঞাপন ছড়ায় (১) জিন হ'তে হেফাযত থাকবে (২) কোন জাদুটোনা কাজে আসবে না (৩) কোন খারাপ তাবীয কাজে আসবে না (৪) মাথা ব্যথা হবে না। এ কথাগুলি কি সত্য?

-হারূণুর রশীদ
বায়তুল ইয্যত, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।

উত্তরঃ যে আংটি দ্বারা রোগ আরোগ্যের আশা করা শিরক। কাজেই ঐ ছাত্রের এই বিজ্ঞাপন ছড়ানো গুনাহে কাবীরা হয়েছে। এতে সে নিজে পাপী হচ্ছে এবং অন্যকে পাপী করছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'নিশ্চয়ই তাবীয

লটকানো শিরক' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৫৫২; আহমাদ, হাকেম, ছহীহুল জামে' হা/৬৩৯৪)*। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'হে নবী আপনি ওদেরকে বলুন! তোমরা ভেবে দেখেছ কি? যদি আল্লাহ আমাকে কষ্ট দেওয়ার ইচ্ছা করেন, তবে তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে দিয়ে যাদেরকে ডাক তারা কি সে কষ্ট দূর করতে পারবে? অথবা তিনি আমার প্রতি রহমত করার ইচ্ছা করলে তারা কি সে রহমত প্রতিরোধ করতে পারবে? আপনি বলুন, আমার জন্য আল্লাহ যথেষ্ট। তাঁর উপরেই ভরসাকারীগণ ভরসা করে থাকে' *(যুমার ৩৮)*। অত্র আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, রোগ মুক্তির কাজ আল্লাহ্র, আংটির নয়।

ইমরান ইবনু হুসাইন থেকে বর্ণিত একদা নবী করীম (ছাঃ) 'এক ব্যক্তির হাতে তামার বালা দেখে বললেন, এটা কি? সে বলল, দুর্বলতার কারণে (ব্যবহার করছি)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, এটা খুলে ফেল কারণ এটা তোমার দুর্বলতা বৃদ্ধি করা ছাড়া আর কিছুই করতে পারে না। তুমি যদি মারা যাও আর এই বালা যদি তোমার হাতে থেকে যায়, তাহ'লে তুমি পরিত্রাণ পাবে না' *(আহমাদ, হাদীছ ছহীহ, কিতাবুত তাওহীদ ৩৮ পৃঃ)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বালা বা আংটি রোগমুক্তির আশায় ব্যবহার করা হারাম, যার পরিণাম জাহান্নাম।

প্রশ্নঃ (৪০/১৬০)ঃ মাসিক 'আত-তাহরীক' জুলাই '০৪-এর মহিলাদের পাতা থেকে জানতে পারলাম যে, গোলাম মুছত্বফা অর্থ মুছত্বফার বান্দা। এ নাম রাখা জায়েয নয়, এটি শিরকের পর্যায়ে পড়ে। কিন্তু জনৈক টাইটেল পাশ মৌলভীর নিকট জানতে পারলাম যে, গোলাম মুছত্বফা অর্থ সম্মানিত বান্দা। তাহ'লে এ অর্থে গোলাম মুছত্বফা নাম রাখা জায়েয হবে কি?

-মুহাম্মাদ মুছত্বফা
বরইতলা, কাজীপুর, সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ মাসিক 'আত-তাহরীক'-এ 'গোলাম মুছত্বফা'-কে مضاف و مضاف إليه তথা সম্বন্ধসূচক পদ-এর ভিত্তিতে ব্যবহার করে অর্থ নেয়া হয়েছে মুছত্বফার গোলাম। এ দৃষ্টিতে 'আত-তাহরীক'-এ ব্যবহৃত অর্থ ঠিক আছে।

তবে গোলাম মুছত্বফা কে موصوف وصفت তথা গুণবাচক পদ-এর ভিত্তিতে ব্যবহার করলে অর্থাৎ মুছত্বফা শব্দটিকে যদি গোলাম এর বিশেষণ (صفت) ধরা হয়, তাহ'লে গোলাম মুছত্বফা অর্থ দাঁড়াবে 'বাছাইকৃত বান্দা'। আর এ দৃষ্টিতে গোলাম মুছত্বফা নাম রাখা যায়। কিন্তু উপমহাদেশে 'মুছত্বফা' শব্দটি রাসূলের গুণবাচক নাম হিসাবে ব্যবহৃত হয়। আর সেদিকে সম্বন্ধ করেই 'গোলাম মুছত্বফা' নাম রাখা হয়। অর্থাৎ 'মুছত্বফা মুহাম্মাদের গোলাম'। সেকারণে উক্ত নাম রাখা শিরকের পর্যায়ে পড়ে।

তাবলীগী ইজতেমা ২০০৫

তারিখঃ ২৪ ও ২৫শে ফেব্রুয়ারী
১২ ও ১৩ ফাল্গুন ১৪১১
রোজ ঃ বৃহস্পতি ও শুক্রবার।
স্থানঃ নওদাপাড়া ট্রাক টার্মিনাল, রাজশাহী।
উদ্বোধন ঃ ১ম দিন বাদ আছর।

ভাষণ দিবেনঃ

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ ও দেশ-বিদেশের খ্যাতনামা ওলামায়ে কেরাম।

দলে দলে যোগ দিন, অহি ভিত্তিক সমাজ গঠনের শপথ নিন!

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

কেন্দ্রীয় কার্যালয়ঃ দারুল ইমারত আহলেহাদীছ, নওদাপাড়া (বিমান বন্দর রোড), রাজশাহী।
ফোন ও ফ্যাক্সঃ (০৭২১) ৭৬০৫২৫, ফোনঃ ৭৬১৩৭৮, ৭৬১৭৪১, মোবাইল -০১৭১ ৫৭৮